বঙ্গ

কমলবার্তা

জুন সংখ্যা। ২০২৪

ইতিহাস গড়ে আবার একবার মোদী সরকার

২০১৪	২০১৯	২০২৪

রামকৃষ্ণ মিশনকে আক্রমণ
বামেদের সার্থক উত্তরসূরী মমতা

ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে তৃণমূলের কারচুপি

ভারতবর্ষে হিন্দু জনসংখ্যা
কমানোর নতুন চাল

ভারতীয় গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থা
কতটা গণতান্ত্রিক

ভারতীয় জনতা পার্টি
এখন গোটা ভারতের রাজনৈতিক দল

তিন রাজ্যে পদ্মের দাপট
অঙ্কে আবার চন্দ্র

বাংলায়
ভোটকাটুয়া বামফ্রন্ট

ছাব্বিশের মহড়ায় এগিয়ে বিজেপি

তৃতীয় বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

অন্ধ্রপ্রদেশের নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উড়িষ্যায় প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি-র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জুন সংখ্যা। ২০২৪

ভারতীয় জনতা পার্টি এখন গোটা ভারতের রাজনৈতিক দল ৪
জয়ন্ত গুহ

তিন রাজ্যে পদ্মের দাপট: অঙ্কে আবার চন্দ্র ৭
বিনয়ভূষণ দাশ

ভোটকাটুয়া বামফ্রন্ট ৯
সৌভিক দত্ত

ছাব্বিশের মহড়ায় এগিয়ে বিজেপি ১২
অভিরূপ ঘোষ

সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-৭) ১৪

ছবিতে খবর ১৬

রামকৃষ্ণ মিশনকে আক্রমণ: বামেদের সার্থক উত্তরসূরী মমতা ২২
সৌমক পোদ্দার

ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে তৃণমূলের কারচুপি ২৫
পল্লব মণ্ডল

ভারতবর্ষে হিন্দু জনসংখ্যা কমানোর নতুন চাল ২৮
স্বাতী সেনাপতি

ভারতীয় গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক ৩০
নারায়ণ চক্রবর্তী

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

পেলে বা মারাদোনা যেদিন প্রতিপক্ষের বিষাক্ত অনৈতিক ট্যাকল-এ আক্রান্ত হয়ে, অনেকগুলো গোল দিতে পারতেন না সেদিন কিন্তু মানুষের মিছিল মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে পেলে বা মারাদোনা অনেকগুলো গোল দিতে পারল না বলে। দর্শক এবং প্রতিপক্ষ তো তাঁদের খেলা দেখার জন্যই মাঠে আসতো এবং খেলতে নামতো। কেননা সময়টা তখন পেলে বা মারাদোনার যুগ। ঠিক তেমনটাই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজনীতির ময়দানে গোটা ভারত দেখতে চেয়েছে নরেন্দ্র মোদী এবং তার দল বিজেপির আরও উত্থান। খুব স্বাভাবিক। কেননা ভারতীয় রাজনীতিতে আগামী ২০ বছর বিজেপিরই যুগ। আসন সংখ্যা কমুক বা বাড়ুক, একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা কোয়ালিশন সরকার – ভারতের রাজনীতি আগামী ২০ বছর আবর্তিত হবে বিজেপি এবং একমাত্র বিজেপিকে ঘিরেই। আর এ মুহূর্তে সেই আবর্তন নরেন্দ্র মোদীকে ঘিরে, বিজেপির সবচেয়ে বড় শত্রুও সেকথা অস্বীকার করবে না। নির্বাচনের আগে ভোট পন্ডিতদের একটা ধারণা ছিল যে প্রতিপক্ষ বা সব বিরোধী দল একত্রিত হলে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে বলে বলে গোল দেওয়া যায়। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে সেই ভাবনা। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৯৩ আসন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোট ২৩৪ আসন। এককভাবে বিজেপির ২৪০ আসন। কংগ্রেস মাত্র ৯৯। চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং নিতীশ কুমারের জেডিইউ-কে বাদ দিয়ে এনডিএ জোট ২৬৫। টিডিপি এবং জেডিইউ-কে নিয়ে ইন্ডি জোট ২৬৩। রাহুল, মমতারা মুখে যাই বাতেলা দিক না কেন, প্রবল চাপে পড়ে গেছে জনতার রায়ে। ফলাফলে পরিষ্কার, দেশের মানুষ কোন অঙ্কেই কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিজেপি বিরোধী ইন্ডি জোটকে দেশের ক্ষমতায় বসাতে চায় না। এবং তার থেকেও ইন্ডি জোটের কাছে যেটা ভয়ঙ্কর বিষয়, নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি এবং এনডিএ জোটের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল মিলিতভাবে প্রতিপক্ষের শক্তি এবং তাদের আস্তিনে থাকা আক্রমণের শেষ তাসটা কি? প্রতিপক্ষ কিন্তু জানেনা নরেন্দ্র মোদীর পরবর্তী তাস কি? কখন পড়বে সেই তাস তাও জানেনা।

উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র বা ঝাড়খণ্ড - সর্বত্র প্রতিপক্ষের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চেকমেট আসতে পারে যে কোনদিন, যে কোনও দিক দিয়ে কিন্তু যন্ত্রণাময় অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই। মৃত্যুর থেকেও প্রবল সেই যন্ত্রণা। সহ্য করতে না পেরে কেউ হয়ত রাজনীতি থেকে সাময়িক বিরতি নেবে। কোনও মুখ্যমন্ত্রী হয়ত তার নিজের দফতরকেই বিশ্বাস করতে না পেরে সিসিটিভি বসাবে এবং তার নিজের আমলা-পুলিশ-মন্ত্রীদের গালমন্দ করবে। 'চপ্পল ছোড়ায়' উৎসাহিত হবে কংগ্রেসের পাপ্পু – আসলে এসব উন্মাদনা নয়, উন্মাদ হবার প্রাথমিক লক্ষণ। যা অবধারিত ছিল। একে একে ওরা সবাই একদিন কোচবিহারের উদয়ন-জগদীশের মত পূর্ণ উন্মাদ হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ভারতীয় জনতা পার্টি

এখন গোটা ভারতের রাজনৈতিক দল

জয়ন্ত গুহ

২০২৪ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজেপি সেই মানুষজন এবং রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে যেটা বিজেপির ট্র্যাডিশনাল ভোট এরিয়া নয়। যেখানে বিজেপি বা বিজেপি জোটের কখনও কোন সরকার ছিল না। প্রতিপক্ষ ব্যস্ত রইল মোদীকে হারাতে। আর বিজেপি ভারত জুড়ে নিঃশব্দে সেরে নিল একটা বিরাট এক্সপেরিমেন্ট। কি সেটা?

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে সবার কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টি এখন আর শুধু গো-বলয়ের দল নয়। ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন আর উত্তরপ্রদেশ ভিত্তিক দল বলা যাবে না। বিজেপির সাংগঠনিক ও সংসদীয় ভিত্তি এখন আর শুধু উত্তর ও পশ্চিম ভারত নয়। বিজেপি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে উত্তর পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতেও।

যদিও ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের মানে বুথ কর্মী বা পান্না প্রমুখদের কাছে, পার্টির প্রচারকদের কাছে এ কোন নতুন খবর নয়। কেননা ২০২৩ সালের ২৮ মার্চ নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 'বিজেপি খবরের কাগজ বা টিভি-র পর্দার ঝলকানিতে জন্ম নেওয়া কোন দল নয়। বিজেপির জন্ম টুইটার হ্যান্ডেল বা ইউ টিউব চ্যানেলে হয়নি। কার্যকর্তাদের ত্যাগ এবং অক্লান্ত তপস্যায় তৈরি হয়েছে বিজেপি। মাটিতে দাঁড়িয়ে নিরন্তর কাজ করতে করতেই বিজেপির উত্থান। গ্রাম এবং চাষের ক্ষেতে মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্পর্ক তৈরি করেই বিজেপির প্রতিদিন এগিয়ে চলা'। কংগ্রেস বহুবার চেয়েছে জনসংঘের শিকড় উপড়ে ফেলতে। বিজেপিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে বাম-কংগ্রেস। স্বপ্ন সফল হয়নি। উলটে প্রতিদিন দেশ জুড়ে বেড়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের মত কখন কোথায় যদি বিজেপির লোকসভার আসন ১৮ থেকে ১২ তে নেমে আসে বা তার থেকেও যদি খারাপ ফলাফল হয় মানে প্রায় মুছে যায় পার্টি তাহলে সেটা

খবরের দুনিয়ায় বিপর্যয় মনে হলেও প্রতিপক্ষের কাছে যথেষ্ট ভয়ের কারণ। কেননা সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করে বলা যায় বিজেপি ফিরে আসবেই এবং ফিরে আসবে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে। ১৯৮৪ সালে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু নিরাশ না হয়ে, অন্যের মধ্যে দোষ না খুঁজে, কাউকে কোনও দোষারোপ না করে বিজেপি ফিরে গিয়েছিল জনতা জনার্দনের মাঝে। মাটিতে দাঁড়িয়ে কাজ করে, সংগঠনকে মজবুত করে লড়াইয়ের ময়দানে আবারও ফিরে আসে বিজেপি ১৯৮৯ সালে। ৮৪' সালে লোকসভায় বিজেপির আসন ছিল মাত্র ২টি। ১৯৮৯ সালে সেই আসন বেড়ে হয় ৮৫। এটাই বিজেপি। থেমে থাকার কোনও জায়গা নেই। প্রতিদিন আরও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়াই বিজেপির একমাত্র মন্ত্র। আর যদি কখনও পিছিয়ে পড়ে তাহলে নরেন্দ্র মোদীর কবিতার ভাষায় বলা যায়, "যদি রৌদ্র হয় প্রখর নিদারুণ জয় আসবে তেজী ঘোড়ার বেশে"।

রাজনৈতিক পণ্ডিতদের সব কথায় আমল না দিলেও একটা বিষয়ে আমি একমত। আগামী ২৫ বছরে দেশের ক্ষমতায় বিজেপিই থাকবে। গোটা ভারত জুড়ে আরও বেশী ছড়িয়ে পড়বে এবং ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বিজেপি। ২০২৪ নির্বাচনের অনেক আগেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বিজেপি এবারের নির্বাচনে শুধুমাত্র তার ট্র্যাডিশনাল ভোট এরিয়া মানে উত্তর ও পশ্চিম ভারতকে নির্ভর করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে না। বরং ২০২৪ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজেপি সেই মানুষজন এবং রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে যেটা বিজেপির ট্র্যাডিশনাল ভোট এরিয়া নয়। যেখানে বিজেপি বা বিজেপি জোটের কখনও কোন সরকার ছিল না। প্রতিপক্ষ ব্যস্ত রইল মোদীকে হারাতে। আর বিজেপি ভারত জুড়ে নিঃশব্দে সেরে নিল একটা বিরাট এক্সপেরিমেন্ট। কি সেটা? পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক রাজনীতির সমীকরণ এবং আঞ্চলিক দল না হয়েও কিভাবে একটি জাতীয় দল বিভিন্ন গোষ্ঠীর রুচি, চাহিদা,

মোদী-নাইডু

অভ্যাস, ভাষা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছের দল, কাছের লোক হয়ে উঠবে। অঞ্চল ভিত্তিক রাজনীতির এই পরীক্ষা নিঃসন্দেহে বিজেপিকে ডিভিডেন্ট দেবে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে।

নজরকাড়া পরীক্ষা অবশ্যই বাম-কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কেরালার লোকসভা আসন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কেরালা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা ও তামিলনাড়ুর ১৩১ লোকসভা আসনের মধ্যে খ্রীস্টান জনসংখ্যা অধ্যুষিত কেরালার থিসুর লোকসভা কেন্দ্রে

মালায়ালম রামায়ণের ক্ষুদে শিল্পীর সঙ্গে কেরালার থিসুরে রামস্বামী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী।

জয়ী বিজেপি। কেরালায় খাতা খুলল বিজেপি। বাম দুর্গ কেরালায় বিজেপির এই বৃদ্ধি অকল্পনীয়। ৭৪,৬৮০ ভোটের ব্যবধানে সিপিআই প্রার্থীকে হারিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ গোপী জিতেছেন ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৩৩৮ ভোটে। এই কেন্দ্রে বিজেপির ভোট শতাংশ বেড়েছে ৯.৬১ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে কংগ্রেসের ভোট শতাংশ কমেছে ৯.৭৫ শতাংশ। কেরালায় বিজেপির ভোট শেয়ার বেড়ে এখন ১৬.৬৮ শতাংশ এবং বিজেপি-ভারত ধর্ম জনসেনার সম্মিলিত ভোট শেয়ার ১৯.২১ শতাংশ। থিসুরে কংগ্রেসের ট্র্যাডিশনাল খ্রীস্টান ভোট বেস, বিশেষ করে খ্রীস্টান মাইনরিটি ও শহরে থাকা ব্যবসায়ীদের ভোট সরে গেছে বিজেপির দিকে। বিজেপির জয়ের ফলে কেরালায় রাজনৈতিক লড়াই এখন ত্রিমাত্রিক। এলডিএফ-ইউডিএফ-এর দ্বিমাত্রিক লড়াই এখন অতীত। ইন্ডি জোটের শরিক ইয়েচুরির সিপিএম প্রায় মুছে গেছে কেরালায়। পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। বেশীরভাগ আসনেই সিপিএম হেরেছে কংগ্রেসের কাছে। কেরালায় ২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে একমাত্র পাথানামথিট্টা লোকসভা কেন্দ্র বাদে প্রতিটি কেন্দ্রে ভোট শেয়ার বেড়েছে বিজেপির। তিরুঅনন্তপুরমে বিজেপি প্রার্থী রাজীব চন্দ্রশেখর মাত্র ১৬,০৭৭ ভোটে পরাজিত হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ শশী থারুরের কাছে। যদিও থারুরের ভোট শেয়ার কমেছে ৪ শতাংশ। বিজেপির বেড়েছে ৪.২২ শতাংশ। এক্ষেত্রে ভোট কেটে সিপিআই তাদের পুরনো বন্ধু কংগ্রেসকে জিততে সাহায্য করেছে।

তামিলনাড়ুতে সর্বশক্তি দিলেও লোকসভায় ফলাফল পায়নি বটে বিজেপি কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে রাজ্যে ডিএমকে-কংগ্রেসের জোট। তামিলনাড়ুতে বিজেপির ভোট শেয়ার এখন ১১.২৪ শতাংশ। কংগ্রেসের ১০.৬৭ শতাংশ। ২০১৯-এ বিজেপির ভোট শতাংশ ছিল ৩.৬ শতাংশ। ডিএমকে-র ভোট শতাংশ কমেছে ৬.৫৯ শতাংশ। বিজেপির বেড়েছে ৭.৫৮ শতাংশ। মূলত এআইএডিএমকে জোট ভোট

কাটায় সুবিধা হয়েছে ইন্ডি জোটের। যদিও ইন্ডি জোটের ভোট শতাংশ কমেছে ৬.১৮ শতাংশ। এনডিএ জোটের বেড়েছে ৩.৩১ শতাংশ। চেন্নাই সেন্ট্রাল, মাদুরাই, থিরিভাল্লুর, রামানাথপুরম এবং থেনি লোকসভা কেন্দ্র সহ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি আসনে এবারের নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে ছিল এনডিএ জোটের প্রার্থীরা। ওই ১২ কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে এবার নেমে এসেছে এআইএডিএমকে। ৭টি কেন্দ্রে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে জয়ললিতার এআইএডিএমকে-র। কেরালায় সিপিএম-এর মত তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে সাংঘাতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ছে, দ্রুত উঠে আসছে বিজেপি। ধর্মাপুরী লোকসভা কেন্দ্রে এনডিএ জোটের প্রার্থী পিএমকে-এর সৌমিয়া আনবুমনি ডিএমকে প্রার্থীর কাছে হেরেছেন মাত্র ২০,০০০ ভোটে।

কর্ণাটকে কংগ্রেসের এবার ভোট শেয়ার বেড়েছে। আসন পেয়েছে ৯টি। ভোট শেয়ার বেড়েছে ৮ শতাংশ। বিজেপির কমেছে ৮ শতাংশ। বিজেপি এবার আসন পেয়েছে ১৭টি। ২০১৯এ পেয়েছিল ২৫টি আসন। ভোট শেয়ার ৫১.৩৮ থেকে কমে হয়েছে ৪৬.০৫ শতাংশ। কিন্তু এনডিএ জোট সঙ্গী জেডি(এস)-এর সঙ্গে সম্মিলিত ভোট শেয়ার ৫১.৬৬ শতাংশ। ইন্ডি জোটের কংগ্রেসের ভোট শেয়ার ৪৫.৪৩ শতাংশ। কংগ্রেসের ভোট শেয়ার বাড়লেও কর্ণাটকে এনডিএ জোটের কাছে পিছিয়ে পড়েছে ইন্ডি জোট। কর্ণাটকে লড়াই মূলত দ্বিমাত্রিক। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে জেডি(এস)-এর সামান্য শক্তি বৃদ্ধিতেও বড় বিপদে পড়বে কংগ্রেস।

বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে প্রধানমন্ত্রী

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তেলঙ্গানায় ৪টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। ২০২৪এ ভারত রাষ্ট্র সমিতি এবং কংগ্রেসের স্বপ্ন চুরমার করে বিজেপি পেয়েছে ৮টি আসন। কংগ্রেস ৮টি আসন। চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএস ধুয়েমুছে সাফ। বিজেপির ভোট শতাংশ বেড়েছে ১৫.৪৩ শতাংশ। কংগ্রেসের বেড়েছে ১০.৪৩ শতাংশ। বিআরএস সাফ হয়ে যাওয়ায় বিপদের মুখোমুখি কংগ্রেস। লড়াই এবার এখানে মুখোমুখি। বিধানসভা নির্বাচনে কঠিন লড়াই কংগ্রেসের। ধীরে ধীরে বিজেপি এখানে একাধিক নেতৃত্বের মুখ তৈরি করেছে। বান্দি সঞ্জয় কুমার, জি কিষাণ রেড্ডি, এতেলা রাজেন্দর, অরবিন্দ ধরমাপুরী, রঘুনন্দন রাও, মাধবীলতা এবং রাজা সিং। গোলমাল না হলে তেলঙ্গানার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির।

জোট সঙ্গী

শুধু তেলঙ্গানা নয়, বিজেপির অন্ধ্রপ্রদেশ বিজয়েও উজ্জ্বল আবিষ্কার জনসেনা পার্টির নেতা পবন কল্যাণ এবং টিডিপি-র নারা লোকেশ, চন্দ্রবাবু নাইডুর পুত্র। ২০২৪এর রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্ট-এ, দক্ষিণ থেকে পূর্ব বিজেপি প্রতিটি রাজ্যে নতুন মুখ তৈরি করেছে। তরুণ নেতৃত্ব তৈরি করেছে যারা আগামীদিনে নেতৃত্ব দেবে রাজ্য এবং দেশের রাজনীতিতে। বিহারে লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র চিরাগ পাসোয়ান কিন্তু লম্বা রেসের ঘোড়া। নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত স্নেহের দুই তরুণ, বাঘের বাচ্চা – চিরাগ আর পবন।

দক্ষিণের পাশাপাশি আসাম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারত, সিকিমে গেরুয়া ঝড়। উড়িষ্যায় গেরুয়া সুনামিতে উড়ে গেছে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি। ভোট শেয়ার কমলেও নিতীশ-বিজেপির মোক্ষম প্যাচে বিহারে ধরাশায়ী ইন্ডি জোট। ঝড়ের ঝাপটায় ঝাড়খণ্ডে আজসু-র সঙ্গে এনডিএ জোট ৯টি আসন (বিজেপি ৮), কংগ্রেস ২, জেএমএম ৩টি আসন। সম্ভবত আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়খণ্ডে সাফ হয়ে যাবে জেএমএম এবং সেই শুন্য স্থানের দখল নেবে নতুন রাজনৈতিক দল জয়রাম মাহাতর জেবিকেএসএস।

বাকী রইল বাংলা। ২৯টি আসন জিতেও প্রতি মুহূর্তে জমি হারানোর ভয়ে কাঁপছে তৃণমূল। ২০২৬ দূরের কথা। ২০২৫-এর মার্চ মাস নাগাদ সেনাপতি-সাত্রী-উজির সব যথাস্থানে থাকবে তো? ইন্ডি জোট থাকবে তো? ইন্ডি জোটে থাকবেন তো উদ্ধব ঠাকরে? সমাজবাদী পার্টির ৫ সাংসদ থাকবেন তো যথাস্থানে? মানে জেলের বাইরে না ভিতরে?

তিন রাজ্যে পদ্মের দাপট

অন্ধ্রে আবার চন্দ্র

বিনয়ভূষণ দাশ

অরুণাচল, সিকিম, উড়িষ্যায় গেরুয়া হাওয়ায় উড়ে গেল প্রতিপক্ষ। অন্ধ্রে আবার বিপুলভাবে ফিরে এলেন চন্দ্রবাবু নাইডু। টিডিপি, জনসেনা, বিজেপির জোটের কাছে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে কংগ্রেস এবং জগন্মোহন। যেমনটা উড়িষ্যায় বিজেডি উড়ে গেছে বিজেপির কাছে। নিঃসন্দেহে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক দল এবং জোট নিয়ে বিজেপির সাকসেসফুল পলিটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এন ডি এ) পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে। এর ফলে শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই ভরসা রেখেছে ভারতের আপামর দেশবাসী ।জওহরলাল নেহরুর পরে শ্রী মোদী দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি টানা তৃতীয়বার লোকসভা নির্বাচন জিতে তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। একটানা দশ বৎসর ক্ষমতায় থাকার ফলে কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা যে থাকবে রাজনীতিতে তা স্বাভাবিক ঘটনা।বিজেপি ও তার জোটসঙ্গী দলগুলি প্রত্যাশার চেয়ে কিছু আসন কম পেয়েছে।স্বাভাবিকভাবেই এটা কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এবং কিছু অন্য কারণ যেমন মুসলিম ভোটারদের সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকীকরণ ইত্যাদির যৌথ ফল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশবাসী বিরোধী ইন্ডি-জোট নয়, ভরসা রেখেছেন শ্রী মোদীর উপরেই। সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, তামিলনাড়ু ছাড়া অন্যান্য দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেও বিজেপি আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি সুদূর দক্ষিণের রাজ্য, কম্যুনিস্ট শাসিত কেরালায়ও বিজেপি একটি আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছে। আর কংগ্রেস শাসিত তেলঙ্গানায়ও বিজেপি কংগ্রেসের সঙ্গে ৮ টি করে আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে লোকসভা নির্বাচনে।

কিন্তু বিজেপি বিরোধী কিছু দল; বিশেষকরে ইন্ডি-জোটভুক্ত দলগুলি এবং তৃণমূল কংগ্রেস দল বিজেপির আসন কমেছে এই কারণ দেখিয়ে শ্রী মোদীর পদত্যাগ করা উচিত বলে দাবী করতে শুরু করেছে। যূথবদ্ধ এই অপপ্রচারের ঢক্কানিনাদে তারা চাপা দিতে চাইছে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীদের উড়িষ্যা, অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সিকিম রাজ্যে বিজেপি স্বয়ং অথবা তার জোটসঙ্গীদের ওই রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় আসাকে। মনে রাখতে হবে, এর মধ্যে এযাবৎ বিজেপির অধরা উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গানা রাজ্যও আছে। লোকসভায় বিজেপির আপাত পিছিয়ে পড়ার মধ্যেও এই রাজ্যগুলিতে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীদের ক্ষমতায় আসা বিজেপির পক্ষে ' সিলভার লাইনিং' বা রুপালি আলোর ঝলকানি।

এই চারটি রাজ্যের মধ্যে বিজেপি একাই অরুণাচল প্রদেশ ও উড়িষ্যায় ক্ষমতায় এসেছে। অরুণাচল প্রদেশে আগেও বিজেপি ক্ষমতায় ছিল, এবারও বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। ইন্ডি-জোটের তীব্র অপপ্রচারও বিজেপির ক্ষমতায় আসা রোধ করতে পারেনি। অরুণাচল প্রদেশের মানুষ যে বিজেপির সাথেই থাকতে চায় সেটা আবার প্রমাণিত। অরুণাচল প্রদেশের এই ফলাফল চিনের পক্ষেও এক বিরাট চপেটাঘাত ! অরুণাচল প্রদেশের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত; তা সত্বেও চিন মাঝে মাঝেই তা গুলিয়ে দিতে চায়; চিন মাঝে মাঝেই দাবী করে, এই প্রদেশ নাকি তাদের অঞ্চল। ফলে এই নির্বাচনী ফলাফল তাদের কাছে শিরঃপীড়া বইকি !অরুণাচল প্রদেশের এই ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার অরুণাচল প্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় এল। ৬০ আসন বিশিষ্ট অরুণাচল প্রদেশে বিজেপি একাই ৪৬ টি আসনে জয়ী হয়েছে। এই আসন আগের বারের চাইতে ৫ টি বেশী। পেমা খান্ডু আবারও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। রাহুল গান্ধীর এত ঢক্কানিনাদ সত্বেও কংগ্রেস পেয়েছে একটি মাত্র আসন। মনে রাখতে হবে যে, একসময় অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেসের দুর্গ বলে খ্যাত ছিল। আর উত্তর- পূর্বেরই আরেক রাজ্য, ৩২ আসন বিশিষ্ট সিকিমে বিজেপির সহযোগী দল, সিকিম ক্রান্তিকারী মোরচা (এস কে এম) ৩১ টি আসন দখল করে ক্ষমতায় এসেছে।কংগ্রেস দল একটি আসনও পায়নি। এই নির্বাচনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং এবং ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়াও পরাজিত হয়েছেন। সিকিমে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রেম সিং তামাং। ফলে এন ডি এর মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল।

আবার দক্ষিণের আরেক রাজ্য, অন্ধ্রপ্রদেশে টি ডি পির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন

চন্দ্রবাবু নাইডু বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে সক্ষম হয়েছেন। ২০১৮ সালে বিজেপির হাত ছেড়ে প্রায় রাজনৈতিক নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু, বিজেপির হাত ধরে আবার ফিরে এলেন রাজনৈতিক পাদপ্রদীপের আলোয়। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, একদা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির পুত্র, ওয়াই এস আর কংগ্রেস নেতা জগন্মোহন রেড্ডিকে হারিয়ে টি ডি পি নেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বে এন ডি এ জোট ক্ষমতায় এসেছে।এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এন ডি এ জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। মোট ১৭৫ টি আসনের মধ্যে ১৬৫ টি আসনই পেয়েছে এই জোট। তার মধ্যে টি ডি পি একাই পেয়েছে ১৩৪ টি আসন, বিজেপি পেয়েছে আটটি আসন এবং অন্য জোটসঙ্গী জনসেনা পার্টি পেয়েছে ২১ টি আসন। লোকসভার ২৫ টি আসনের মধ্যে এই জোট পেয়েছে ২১ টি আসন, জগন্মোহনের দল পেয়েছে বাকি চারটি আসন আর কংগ্রেস যথারীতি শূন্য ! প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই ফলাফল সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশ এক ব্যতিক্রমী জয় দিয়েছে এন ডি এ কে; এজন্য আমি রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।' ইতিমধ্যে এন চন্দ্রবাবু নাইডু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। তাঁর হাত ধরে রাজ্যে এন ডি এর রাজত্ব শুরু হয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনে বিশ্লেষণের শেষ পর্বে আসছি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা নিয়ে। উড়িষ্যার নির্বাচনী ফলাফল এক কথায় অভূতপূর্ব। বিজেপির গেরুয়া ঝড়ে বিজেডির দীর্ঘ আড়াই দশকের শাসনের অবসান ঘটল। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের দল বি জে ডিকে চূড়ান্তভাবে ধরাশায়ী করেছে বিজেপি; লোকসভা এবং বিধানসভা উভয় ক্ষেত্রেই। ১৪৭ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বিজেপি একাই পেয়েছে ৭৮ টি আসন। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বি জে ডি পেয়েছে ৫১ টি আসন এবং কংগ্রেস পেয়েছে ১৪ টি আসন। ফলে নবীন পট্টনায়কের ২৪ বৎসরের শাসনের অবসান হল। আর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই পেয়েছে ২০ টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছে একটিমাত্র আসন আর শাসক বিজেডি একটি আসনও পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের এই সার্বিক ভরাডুবির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।বিজেপি তার ভোট শতাংশ ২০১৯ এর ৩৮.৯% থেকে বাড়িয়ে ৪৫.৩ এ নিয়ে এসেছে। বিজেডির ভোট শতাংশ প্রায় ৬% কমেছে এবং কংগ্রেসের ভোট কমেছে ১.৫%। উপকূলবর্তী উড়িষ্যার এই জয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীকে দৃশ্যতই মুগ্ধ করেছে। দিল্লীতে লোকসভা নির্বাচনের পরে যে বিজয় ভাষণ দেন তাতে তিনি 'ভারত মাতাকি কি জয়' ধ্বনির পরেই 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তিনি মন্তব্য করেন,' এই প্রথম বারের জন্য মহাপ্রভু জগন্নাথের দেশে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ' উড়িষ্যায় বিজেপির এই নির্বাচনী সাফল্যের মূলে আছে দলের যথাযথ নির্বাচনী কৌশল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ বিভিন্ন নির্বাচনী র‍্যালিতে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, বিজেডিকে ভোট দিয়ে রাজ্যের কোন লাভ নেই। আর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের দুর্বল স্বাস্থের কারণে তিনি রাজ্যের প্রশাসনে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারছিলেন না; ফলে তাকে অত্যধিক নির্ভর করতে হচ্ছিল প্রাক্তন আইএএস , দক্ষিণী ভিকে পান্ডিয়ানের উপরে। বাস্তবে তিনি এই দক্ষিণী আধিকারিকের 'বন্দী' বা ক্যাপটিভ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং অন্য বিজেডি নেতারা খুশী ছিলেন না বহিরাগত এই প্রাক্তন আধিকারিকের বিশেষ আধিপত্যে। বিজেপি নেতারা নির্বাচনী প্রচারে এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা রাজ্যের উন্নয়ন ও সুশাসনের বিষয়টিও প্রচারে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, ভারতের প্রধান দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠী, বিজেপির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডি- জোট থেকে নবীনের সম-দূরত্বের নীতিও রাজ্যের মানুষ আর পছন্দ করছিলেন না। তাছাড়া নবীন পট্টনায়ক দলের কোন যথার্থ উত্তরাধিকারীও মনোনীত করতে পারেননি। এর ফলে বিজেডিতে এবং রাজ্যের মানুষের মধ্যেও একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। ওদিকে বিজেপি রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার থাকার সুবিধেগুলিও রাজ্যের মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। বিজেপির আদিবাসী নেতা মোহনচরণ মাঝি ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। উড়িষ্যায় বিজেপির এই জয় পশ্চিমবঙ্গের জন্যও এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। দেখা যাচ্ছে, আসাম সহ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিজেপি অথবা তার সহযোগী দলগুলির শাসনাধীনে এসেছে, পশ্চিমের বিহার রাজ্যও এন ডি এ শাসিত রাজ্য; এবারে দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলবর্তী রাজ্য উড়িষ্যাও বিজেপির শাসনাধীনে এল। এই রাজ্যগুলি বিশেষ করে আসাম, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যার ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভীষণ রকমের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

চারদিকের এই রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকেও ভবিষ্যতে যথেষ্ট প্রভাবিত করবে একথা নিশ্চিত করে বলাই যায়। আগামী দিনে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণের সুবাতাস বয়ে আসবে পশ্চিমবঙ্গে--- এটাই হবে বিজেপির উড়িষ্যা জয়ের তাৎপর্য।

ভোটকাটুয়া বামফ্রন্ট

বিজেপির ভোট কেটে তৃণমূলকে জিতিয়ে দিচ্ছে বামফ্রন্ট!

সৌভিক দত্ত

ভোট কেটে বামফ্রন্ট নিজে ভোকাট্টা কিন্তু বিজেপিকে ঠেকাতে ঘোষিত শত্রু তৃণমূলকে তলায় তলায় জিতিয়ে, প্রমাণ করল বঙ্গ রাজনীতিতে তারা তৃণমূলের ভৃত্য। হাতেনাতে প্রমাণ হল বিমান বসুর ফিশফ্রাই জোট। এরাজ্যে বামফ্রন্ট এখন ভোটকাটুয়া ফ্রন্ট।

বাংলায় একটা কথা আছে,নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা। বর্তমানে ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থী শিবির আদতে সেই ভূমিকাই পালন করছে।

একটা সময় ছিল যখন আসলেই বামপন্থী শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। এই খুব বেশী দিনও তো না,২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও একটা প্রবল সম্ভাবনা ছিল বামপন্থীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার। যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয় না,তৃণমূল কংগ্রেসই ক্ষমতায় ফেরে আর সেটাও প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল জোট না করে একক শক্তিতে ক্ষমতায় আসে। আর এখানেই বিপদ ঘনিয়ে আসে বামেদের! কারণ তারা বুঝে যায় তাদের ভোটব্যাঙ্ক অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখন তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে ধীরে ধীরে উত্থান ঘটছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের! কমিউনিজমের ঘুমের ওষুধ দিয়ে হিন্দুদের যে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল দীর্ঘকাল, সেই ঘুম ভাঙতে শুরু করেছিল দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর বজ্র আহ্বানে। হিন্দুরা হয়ে উঠছে আত্মসচেতন। ক্ষমতা বাড়ছে বিজেপির! নতুন শক্তিকেন্দ্র তৈরী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার আবর্তে।

আর এখানেই বামপন্থীরা বুঝে যায় যে দিন পাল্টেছে। কী যে দিন ছিলো নাতি,থাবা থাবা চিনি খাতি - র মতো বামপন্থার সোনালি দিন শেষ। আর কোনোদিনই ক্ষমতা হাতে পাবে না বামফ্রন্ট। সংখ্যালঘু ভোট ও সেকুলার - লুম্পেন হিন্দু ভোট তৃণমূলে,হিন্দু ভোট বিজেপিতে। তাহলে বামফ্রন্ট বাঁচবে কী নিয়ে? ফলে বদলাতে হল তাদের কৌশল। ক্ষমতা পাওয়ার আশা ছেড়ে দিল তারা। অঘোষিতভাবে ভিড়ে গেলো তৃণমূল কংগ্রেসের কোলে অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী শিবিরে। তৈরী হল লেসার ইভিল থিওরি। বামেরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে শুরু করল যাতে বিজেপি ক্ষমতায় না আসে আর তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হয়। কেন? আসলে একসময় যারা বাম শিবিরে ছিল, সেই সংখ্যালঘু আর সেকুলার হিন্দুরাই তো আজকের তৃণমূল! আদতে তো তারা একই পরিবারেরই সদস্য। তাই তৃণমূল তথা উন্নততর বামফ্রন্টকে রক্ষা করতে বামপন্থীরা নিয়ে এলো নতুন কৌশল - ভোট কাটাকাটি খেলা। বিজেপির ভোট কেটে তৃণমূলকে বাঁচিয়ে দেওয়া। ও হ্যাঁ,লেসার ইভিল থিওরিটা বলা হয়নি। এটা তৃণমূলের হয়ে বামপন্থীদের রাজনৈতিক ভৃত্যগিরির একটা তাত্ত্বিক রুপ বলা যায় । মোটের উপরে এখানে বলা হয় যে,সিপিআই(এম) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবেনা এটা নিশ্চিত। তাহলে আসবে কে? হয় তৃণমূল আর না হয় বিজেপি। এদের মধ্যে বামপন্থীদের কাছে নিকটতম হল তৃণমূল। আর তাই তৃণমূল হল অপেক্ষাকৃত

কম ক্ষতিকর অর্থাত লেসার ইভিল। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে খাতায় কলমে বহুদলীয় গণতন্ত্র আছে। অনেক দল, অনেক নির্দলীয় প্রার্থী এখানে নির্বাচনে অংশ নেয়। ভারতের সংবিধান তাদের সেই অধিকার দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা অবশ্যই সম্পূর্ণ আলাদা। বাস্তবে এখানে লড়াই হয় দুটো দলের মধ্যেই। বাকি দলগুলো প্রধান দলদের ভোটে জিততে সাহায্য করে। কখনো সহযোগী হিসাবে জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আবার কখনো ভোট কাটাকুটি করে।

হিসাবটা বুঝিয়ে দি বরং। ধরা যাক মোট ভোটার ১০০ জন। আছে তিনটে রাজনৈতিক দল – এ, বি, এবং সি! এ হল শাসক দল, বি বিরোধী এবং সি ও বিরোধী তবে তলে তলে এ-এর হয়ে কাজ করছে। এখন সরকারী দলের পক্ষের সব ভোট তো এ-তেই পড়ছে। ধরলাম তার সংখ্যা ৪০! বাকি ৬০ টা ভোট স্বাভাবিকভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখানেই খেলে দেবে সি! তারা মানুষের কাছে প্রচার করবে যে বি নয়, সি-রাই হল আসল বিরোধী দল, ক্ষমতাসীন দলকে হারাতে গেলে সবার উচিত সি-কে ভোট দেওয়া। এবার কিছু মানুষ তাতে ভুল বুঝবেই বুঝবে। কিছু আবার থাকবে তাদের কোর ভোটার! তারা রাজনীতি বোঝেনা কিন্তু বাবা বলেছে সি ভালো দল তাই ভোট দেয় ধরণের আর কি! ধরে নিলাম বাকি ৬০ জনের মধ্যে ২৫ জন গিয়ে ভোট দিল সি-কে। ব্যস। খেলা ওখানেই শেষ। বি দল পেল ৩৫ টা ভোট আর জিতে যাবে এ দল! ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতা করার নামে আদতে ক্ষমতাসীন দলকেই জিততে সাহায্য করে দিল সি! আর ২০১৬-র পর থেকে ঠিক এটাই হয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। যেটা সবশেষে খুব জঘন্যভাবে ঘটল '২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে। তৃণমূল বিরোধী প্রচার করে আদতে তৃণমূলকেই বেশিরভাগ সিটে জিতিয়ে দিল বামপন্থীরা! একটু উদাহরণ দিয়েই বোঝাই বরং।

দমদম লোকসভা কেন্দ্র

আমরা দমদম কেন্দ্রের কথাই যদি ধরি। তৃণমূল পেয়েছে ৫,২৮,৫৭৯ টি ভোট। বিজেপি পেয়েছে ৪,৫৭,৯১৯ টি ভোট। অপরদিনে বামফ্রন্ট ভোট কেটে নিয়েছে ২,৪০,৭৮৪ টি ভোট। কংগ্রেস ও অন্যান্যরাও কিছু কেটেছে। অর্থাৎ তৃণমূলের পক্ষের থেকেও তৃণমূল বিরোধী দমদমে বেশি। কিন্তু তাও জিতে গেল তৃণমূল। কেন? সৌজন্যে বামফ্রন্টের কেটে নেওয়া বিরোধী ভোট।

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র

ব্যারাকপুর কেন্দ্রের দিকে তাকাই। তৃণমূল পেয়েছে ৫,২০,২৩১ টি ভোট। বিজেপি পেয়েছে ৪,৫৫,৭৯৩ টি ভোট। তার মানে কি এখানে তৃণমূলের সমর্থক বেশি? একদমই না। বামফ্রন্ট এখানে কেটে নিয়েছে ১,০৯,৫৬৪ টি ভোট। অর্থাৎ তৃণমূল বিরোধী ভোট কেটে তৃণমূলকে জিততে সাহায্য করল ওরা।

কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র

একইভাবে যদি দেখি কৃষ্ণনগরের দিকে। তৃণমূলের (৬,২৮,৭৮৯ টি ভোট) প্রায় ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে বিজেপি (৫,৭২,০৮৪ টি ভোট)! তাহলে বিজেপি হারল কেন? বেশিরভাগ মানুষ তৃণমূলকে চেয়েছিল? না, এখানে তৃণমূল বিরোধী ভোট কেটে তৃণমূলকে জিতিয়ে দিয়েছে বামফ্রন্ট (১,৮০,২০১ টি ভোট)!

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র

আসানসোলেও একই গল্প। তৃণমূল পেয়েছে ৬,০৫,৬৪৫ টি ভোট। বিজেপি পেয়েছে ৫,৪৬,০৮১ টি ভোট। আর বামফ্রন্ট কেটে নিয়েছে ১,০৫,৯৬৪ টি ভোট। যে ভোট বিজেপিতে আসলে তৃণমূলের হার ছিল অবশ্যম্ভাবী।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্র

হুগলিতেও একই কাজ করেছে বামফ্রন্ট। তৃণমূল পেলো ৭,০২,৭৪৪ টি ভোট। বিজেপি পেলো ৬,২৫,৮৯১ টি ভোট। আর বামফ্রন্ট কেটে নিলো ১,৩৯,৯১৯ টি ভোট। মানে সেই একইভাবে পেছনের দরজা দিয়ে তৃণমূলকে জেতানোর গল্প।

দমদম, ব্যারাকপুর, কৃষ্ণনগর, আসানসোল, হুগলির প্রায় ১২ টি কেন্দ্রে সিপিআই(এম) নিজের নাক কেটে বিজেপি প্রার্থীদের দিল্লিযাত্রা ভঙ্গ করেছে। যেমন আরামবাগের ব্যবধান ৬,৩৯৯ (বামফ্রন্ট পেয়েছে ৯২,৫০২), মেদিনীপুরে ব্যবধান ২৭,১৯১ (বামফ্রন্টের ভোট ৫৭,৭৮৫), বাঁকুড়াতে ব্যবধান ৩২,৭৭৮ (বামফ্রন্ট ১,০৫,৩৫৯), কৃষ্ণনগরে ব্যবধান ৫৬,৭০৫ (বামেরা পেয়েছে ১,৮০,২০১), ব্যারাকপুর ব্যবধান ৬৪,৪৩৮ (অথচ বামফ্রন্ট পেয়েছে ১,০৯,৫৬৪), আসানসোলে ব্যবধান ৬৯,৫৬৪ (বামেরা পেয়েছে ১,০৫,৯৬৪), দমদমে তৃণমূলের থেকে বিজেপি পিছিয়ে আছে ৭০,৬৬০ ভোটে (অথচ বামফ্রন্ট পেয়েছে ২,৪০,৭৮৪), হুগলিতে ব্যবধান ৭৬,৮৫৩ (বামেদের ভোট ১,৩৯,৯১৯) - এভাবেই বর্ধমান দুর্গাপুর, বর্ধমান পূর্ব, শ্রীরামপুর এমনকি যাদবপুরেও এটা স্পষ্ট যে যদি বামপন্থীরা বিরোধী ভোট ভাগ না করত, তাহলে এই রাজ্যে তৃণমূলের পাওয়া আসন সংখ্যা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া স্রেফ বাঁ হাতের কাজ হত।

আর এটা কি বামেরা জানত না? অবশ্যই জানত। খুব ভালোভাবেই জানত। একটা ছোট বাচ্চাও বোঝে যে ভাগ হলে দুর্বল হতে হয়, ছোটোবেলায় গল্পের নীতিকথায় পড়ানো হয়, United we stand, divided we fall! আর এটা বামেরা বোঝেনা?

নিশ্চয়ই বোঝে। কিন্তু তারপরেও তৃণমূল বিরোধী ভোট ভাগ করা হল কেন? কোন স্বার্থে? এটা বাংলার সাধারণ মানুষদের ভেবে দেখা উচিত। আসলে যারা তৃণমূলী অপশাসন দূর করে বাঙালির জীবনে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী, তারা কেন ভোট ভাগ করে তৃণমূলকেই শক্তিশালী করবে? তাহলে প্রকৃত সেটিংটা আসলে কাদের মধ্যে আছে? আর কেনই বা বিজেপিকে হারাতে সবাইকে তলে তলে জোট বাঁধতে হবে? ঠিক কাদের অস্তিত্ব সংকট লুকিয়ে আছে হিন্দুদের জাগরণের মাঝে? কারা চায় হিন্দুদের অধিকারের দাবিকে পিষে দিতে যে তাদের খুশি করতে এককালের শত্রু তৃণমূলকে সাহায্য করতে বাধ্য হয় সিপিআইএম? ঠিক কার কোন হাতে এই দুই কাঠপুতুলের সুতুলিগুলো বাঁধা?

বাঙালিকে কিন্তু ভাবা অভ্যাস করতেই হবে।

বিজেপি
বড় সিদ্ধান্ত ওড়িশার
বিজেপি সরকারের
ওড়িশায় বিজেপি
সরকার গড়তেই
মহিলাদের জন্য শুরু
হলো সুভদ্রা যোজনা
মাহলাদের জন্য শুরু
হলো সুভদ্রা যোজনা
বছরে ৫০ হাজার
টাকা পাবেন ওড়িশার
মহিলারা
ইচ্ছামত প্রত্যেক
মাসেও তোলা যেতে
পারে ৪২০০ টাকা
বিজেপি শাসিত
রাজ্যেগুলিতে
আত্মনির্ভতার পথে
এগিয়ে চলেছে মহিলারা
জয় হোক মাতৃশক্তির
/BJP4Bengal bjpbengal.org

ছাব্বিশের মহড়ায় এগিয়ে বিজেপি

উপনির্বাচনে লড়াই হবে চোখে চোখ রেখে

অভিরূপ ঘোষ

ছাব্বিশের মহড়ায় কিন্তু সত্যি এগিয়ে বিজেপি। কেননা লোকসভা নির্বাচন কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দিয়ে বারেবারে জেতা যাবেনা। শহরের মানুষ, পুরসভা এলাকার মানুষের কাছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দিয়ে তৃণমূল তার পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিকে ঢাকতে পারেনি। সুভদ্রা, অন্নপূর্না সহ একাধিক সামাজিক প্রকল্প, ১২ জন সাংসদ এবং বাংলার ২ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে উপনির্বাচনে ঝড় তুলতে আসছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যানী ছিলেন ব্যবসায়ী মানুষ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন তিনি। টিকিটও মেলে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেশ ভালো মার্জিনে জেতেন তিনি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রবল চাপ তথা ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতি এবং অযাচিত লাভের সুযোগ সম্ভবত তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই ওই বছরই অক্টোবর মাসে যোগ দেন তৃণমূলে। পুরস্কার হিসেবে মেলে চব্বিশের লোকসভা ভোটের টিকিট। কিন্তু ওটুকুই। তৃণমূলের টিকিট মিললেও জয়ের স্বাদ তিনি পাননি। পুলিশ, প্রশাসন তথা হার্মাদ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েও তৃণমূল তাকে জেতাতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদে ৬৮,১৯৭ ভোটের বিপুল মার্জিনে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পাল।

এই লোকসভারই রায়গঞ্জ বিধানসভায় এবার উপনির্বাচন। মানুষ নিজের ভোটটুকু দিতে পারলে এই উপনির্বাচনে বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। সর্বশেষ নির্বাচন অর্থাৎ ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে শুধু রায়গঞ্জ বিধানসভা ক্ষেত্রেই ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আছে ৪৬,৭৩৯ ভোটে। ওই বিধানসভা ক্ষেত্রে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৯৩,৪০২, তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৪৬,৬৬৩ এবং বাম কংগ্রেস জোটের প্রাপ্ত ভোট ১৪,৪৭৭। রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া বাম কংগ্রেস জোটের ভোটসংখ্যা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বিবিধ। প্রথমত, তৃণমূলের অপশাসন থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে চান যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা তাদেরকে বোঝানো যে বাম কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে আসলে তা তৃণমূলেরই হাত শক্ত করা। দ্বিতীয়ত, পরিষ্কারভাবে এই হিসাব পেশ করা যে তৃণমূলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জোট করে নির্বাচনে লড়াইয়ের অভিনয় করা বাম কংগ্রেসের নেতৃত্ব যদি বিজেপি বিরোধীতার হাওয়া তুলে তৃণমূলের সুবিধা করতে চায়, তাতেও বাম-কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মোট ভোটের থেকেও বিজেপির প্রাপ্ত ভোট প্রায় ৩২ হাজার বেশি। তৃতীয়ত, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, দীপা দাশমুন্সি এবং পরবর্তীতে সিপিএমের মহম্মদ সেলিমকে সাংসদ করে দিল্লিতে পাঠানো রায়গঞ্জ যে কিছুই না পেয়ে বাম কংগ্রেসের থেকে মুখ ফিরিয়েছে তা সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে দেখানো।

লক্ষণীয় যে এই বিধানসভা ক্ষেত্রে তৃণমূলের দ্বিগুণ ভোট পাওয়া বিজেপি শুধু যে রায়গঞ্জ বিধানসভা এবং লোকসভা ক্ষেত্রে জিতেছে তাই নয় বরং প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা এবং জয়ের মার্জিনও বাড়িয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে বিধানসভা উপনির্বাচনে আবার তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়ানো কৃষ্ণ কল্যাণী হারবেন আরো বেশি ভোটে।

রায়গঞ্জের মত একই গতিতে বিজেপির বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রেও। বিজেপি টিকিটে মুকুটমনি অধিকারী জিতে এসেছিলেন রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র (রানাঘাট লোকসভার অন্তর্গত) থেকে ২০২১ সালে। তার আগে ২০১৯ সালে প্রাথমিকভাবে বিজেপি তাকে রানাঘাট কেন্দ্রের লোকসভা প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু যথাসময়ে নমিনেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করতে পারেননি তিনি। তাই তার পরিবর্তে বিজেপির অনুগত সৈনিক জগন্নাথ সরকারকে প্রার্থী করে দল। জগন্নাথবাবু প্রবল প্রতাপে জিতে নেন রানাঘাট লোকসভা। এদিকে মনোনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড়ের ব্যর্থতার পরেও মুকুটমনি অধিকারীর উপর ভরসা রেখেছিল বিজেপি। লোকসভার দুবছর পর বিধানসভায় প্রার্থী করা হয় তাকে। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের প্রবল প্রচেষ্টায় জিতে বিধায়কও হন তিনি।

কিন্তু এরপরে লোকসভা ভোটের আগে মুকুটমনি অধিকারীর নামে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়ে দলের কাছে। দল কারণ জানতে চায় তার কাছে। কারণ জানাতে পারার ব্যর্থতায় তথা পুলিশি তদন্তের ভয়ে তথা লোকসভায় টিকিট মিলবে না একথা পূর্ব অনুমান করে ভোটের ঠিক আগে মুকুটমনি অধিকারী যোগদান করেন তৃণমূলে। রাজ্যের শাসক দল তাকে রানাঘাট কেন্দ্রে লোকসভার প্রার্থীও করে। যদিও তাতে লাভের লাভ কিছু হয়নি। জননেতা এবং নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ স্নেহধন্য বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের কাছে ১,৮৬,৮৯৯ ভোটের বিপুল মার্জিনে হেরে যান তৃণমূলের মুকুটমণি অধিকারী। মজার কথা হল মাননীয় জগন্নাথ বাবুর ভোট কাটার উদ্দেশ্যে একই নামের একজনকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায় তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলের স্নেহধন্য সেই ভদ্রলোকের কপালে গোটা লোকসভায় মোট ৫৮৬৯ এবং রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভায় ৯২৯টি ভোট জোটে মাত্র।

বিধানসভা উপনির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে আবার মুকুটমনি অধিকারীকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। কিন্তু তার কি জেতার ন্যূনতম সম্ভাবনা আছে! উত্তর হল, না। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে বিধায়ক হিসাবে দল পাল্টে তৃণমূলে যাওয়া মুকুটমনির জেতার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। শেষ লোকসভা ভোটে বিধানসভা নিরিখে রানাঘাট দক্ষিণে বিজেপি পেয়েছিল ১,২৩,৫৬৮ ভোট। ৩৬,৯৩৬ ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল দু'নম্বরে (প্রাপ্ত ভোট ৮৬,৬৩২) এবং মাত্র ২১,২১৯ ভোট পেয়ে বামেরা তিন নম্বরে শেষ করে। অর্থাৎ তৃণমূলের বি টিম বাম কংগ্রেসের ভোট মিললেও এই আসনে বিজেপিকে টেক্কা দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

বিজেপির প্রায় নিশ্চিত জয়ের এই প্রত্যাশা বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। উপরের দুজনের মতো তিনিও সাধারণ নির্বাচনের দল বদলে তৃণমূলে যান এবং বনগাঁ কেন্দ্র থেকে লোকসভার টিকিট আদায় করেন। এবং উপরের দুজনের মতোই পরিণতি হয় তারও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের চোখের মণি বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে ৭৩,৬৯৩ ভোটে হেরে যান তিনি। যে বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে শুধু সেখানেই ২০,৬১৪ ভোটে বিজেপির থেকে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল (বিজেপি ১,১২,৭০৪, তৃণমূল ৯২,০৯০ আর বামেরা মাত্র ৪৮৩৯ ভোট পায়)। যে কোন বিধানসভা নির্বাচনে ২০,৬১৪ ভোট ভালো মার্জিন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে এই কেন্দ্রেও বিজেপি প্রার্থীর জয় একপ্রকার সুনিশ্চিতই বলা চলে।

যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে ক'দিন পরে তার শেষ ক্ষেত্র মানিকতলা। লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে বিজেপি এখানে মাত্র ৩৫৭৫ ভোটে পিছিয়ে থাকলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃণমূলের জোট সঙ্গী তথা বিশেষ সুবিধাভোগী বামেরা পেয়েছিল ৯৪২১ ভোট। আশা করা যায় তৃণমূল বিরোধী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানিকতলার বাসিন্দারা এরপর আর ভোটকাটুয়া বামেদের সুইচ টিপে নিজেদের মূল্যবান ভোট নষ্ট করবেন না। একই সাথে তৃণমূলের চরম অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন তাঁরা। এমতাবস্থায় মানিকতলা কেন্দ্রেও বিজেপির জেতার একটা ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কর্তব্য কী? তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিবিধ। এক, হার্মাদ বাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে শাসক তৃণমূল চাইবে ভোট লুট করে জিততে। বিজেপি কার্যকর্তা তথা সমর্থকদের প্রথম কাজ বুক চিতিয়ে লড়াই করে ভোট লুট আটকানো। মাথায় রাখতে হবে সবাই যদি সকাল-সকাল গিয়ে নিজের ভোটটা নিজে দিয়ে আসতে পারে তবে বিজেপির জয় নিষ্কন্টক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তৃণমূলের তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শন তথা ভোট লুটের চেষ্টা থাকবে। কিন্তু ভোট গণনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে ভয় পাওয়ার কোন অবকাশ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের নেই।

দুই, ২৮ দলের ইন্ডি জোটের মোট আসনের থেকেও বেশি সিটে জয়ী হয়ে লোকসভার একক বৃহত্তম দল হয়েছে বিজেপি। শাসক তৃণমূলের (২৯) থেকে আট গুণেরও বেশি সাংসদ (২৪০) নিয়ে লোকসভায় ঢুকবে বিজেপি। এনডিএ হিসাব করলে এটার সংখ্যা আরো অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও চারপাশে এমন একটা হাওয়া তৈরি করা হচ্ছে যেন লোকসভা ভোটে বিজেপি হেরেছে আর তৃণমূল জিতেছে। এই নেগেটিভ প্রচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। মানুষকে বোঝাতে হবে তৃণমূল এবং তার দোসর বামেরা যতই চিৎকার করুক না কেন পরবর্তী পাঁচ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন নরেন্দ্র মোদীই।

তিন, বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তথা বিজেপির শত্রুরা অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগানোর প্রবল প্রচেষ্টা করছে প্রতি মুহূর্তে। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের সদা সচেতন থাকতে হবে এর মোকাবিলা। মাথায় রাখতে হবে গোটা ভারতীয় জনতা পার্টি একটা পরিবার। বাইরের কেউ যেন এই পরিবারে ফাটল ধরানোর চেষ্টায় এক শতাংশও সফল না হয়।

ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের অপশাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে গেলে এই চার বিধানসভা ক্ষেত্রের উপ-নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। চারপাশে যে নেগেটিভ পরিবেশ তৈরি করে বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে তার সামনে যোগ্য জবাব হতে পারে এই চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। বাংলার মানুষ যদিও জবাব তৈরি করেই রেখেছে। যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয় তবে মানিকতলা কেন্দ্র ছাড়া বাকি তিন জায়গায় বিজেপির সঙ্গে লড়াই করার মত পরিস্থিতিতে নেই তৃণমূল। মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পারলে রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা এবং রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে জাস্ট ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যাবে তৃণমূল। আর মানিকতলা কেন্দ্রে লড়াই হলেও মানুষ তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধেই ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেক্ষেত্রে এই উপনির্বাচন থেকেই বেজে যেতে পারে ছাব্বিশে তৃণমূলের বিদায় ঘন্টা।

গল্প হলেও সত্যি
হীরক রানির
কুকীর্তি

শিল্প বিরোধী হীরক রানি

ছবিতে খবর

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় ক্রীড়া ভারতী আয়োজিত অনুষ্ঠানে কার্যকর্তাদের সঙ্গে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

মালদায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খান ও রাজ্য নেতৃত্ব।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলেন রাজ্য মহিলা মোর্চার কর্মী ও নেত্রীবৃন্দ।

রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী মানস কুমার ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভার সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল।

কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েতে "স্থায়ী সমিতির" সাধারণ সভায় তৃণমূলের নির্মম প্রহারে আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী মৌমিতা সিংহকে দেখতে হাসপাতালে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তৃণমূলের আক্রমণে আক্রান্ত বিজেপি যুব কর্মকর্তা অনুপম সাঁত্রের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ।

নির্বাচনে পরবর্তী হিংসায় কোচবিহারে আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপির ৫-সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি।

নিউ জলপাইগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে দেখা করলেন রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

ছবিতে খবর

দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকার্য তদারকি করে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে দার্জিলিং-এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা।

কলকাতার মহেশ্বরী ভবনে ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপির ৫-সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি।

জয়নগর সাংগঠনিক জেলার ক্যানিং কুলতলী সহ বিভিন্ন এলাকায় ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

তিস্তা নদীর বন্যায় আক্রান্ত রিয়াং গ্রামে দার্জিলিং লোকসভার বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা।

অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপি দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি।

বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপি কাঁথি সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন।

নির্বাচনের দিন পুলিশ ও তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত সন্দেশখালির বিজেপি কার্যকর্তা ও তাদের পরিবারের সাথে দেখা করতে হাসপাতালে বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবসে তাঁর প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে বিধানসভায় দলের সতীর্থ বিধায়কদের সঙ্গে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

ছবিতে খবর

সন্দেশখালিতে রেখা পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললেন বিজেপির কেন্দ্রীয় দল।

জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মসজিদবাতি গ্রামে বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির ৫-সদস্যের কেন্দ্রীয় দল।

ডায়মন্ডহারবারে রাজনৈতিক হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির ৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় দল।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে মহারাজের কাছে আশীর্বাদ নিতে পুরুলিয়া লোকসভায় বিজেপির বিজয়ী সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

ভারত সেবাশ্রম সংঘে মহারাজের কাছে আশীর্বাদ নিতে পুরুলিয়া লোকসভার বিজয়ী সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার হিংলি শেওলাপাড়া এলাকায় তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত একাধিক পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বনগাঁ লোকসভার সাংসদ শান্তনু ঠাকুর।

বিজেপি কাঁথি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে বিজেপির বিজয়ী সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

রাঙ্গাপানিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের খোঁজ নিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডঃ জয়ন্ত কুমার রায়।

শিলিগুড়ির কাছে রাঙ্গাপানিতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

রামকৃষ্ণ মিশনকে আক্রমণ
বামেদের সার্থক উত্তরসূরী মমতা

সৌমক পোদ্দার

ব্রিটিশ আমল থেকে শাসকের রক্তচক্ষুর শিকার সবসময়ই হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন। কমিউনিস্ট নেতা কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত তো বলেই ফেলেছিলেন- "আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে বেলুড় মঠের মন্দিরকে আমরা কফি হাউস বানাবো"। এবার হুমকি দিলেন কালীঘাটের 'মমতাময়ী'। ভুলে যাবেন না মাননীয়া, মানুষ কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন নিয়ে ৩৪ বছরের বাম দাম্ভিকতার শিকড়ও উপরে ফেলেছিল।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন একটি রাজনৈতিক জনসভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সেবাধর্মী ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন। প্রশ্ন তুললেন, তাদের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে। বললেন, এই সংগঠন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির সপক্ষে প্রচার করে। যা অতীব মিথ্যাভাষণ। নোংরা রাজনীতির নাগপাশে তিনি কালিমালিপ্ত করতে তৎপর হলেন এই দুই আন্তর্জাতিক হিন্দু সংগঠনকে।'জীবে সেবা করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'- মানবজাতির সেবার আদর্শই যাদের জীবনব্রত, তুষ্টিকরণ রাজনীতির লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের কালিমালিপ্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী বিন্দুমাত্র ইতস্তত বোধ করলেন না। ভাবলেন না, অসংখ্য রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ভাবানুরাগীর কথা। অবশ্য ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু করে পূর্বতন বামপন্থী শাসন হয়ে অধুনা মমতা সরকার - প্রত্যেকেরই রক্তচক্ষুর কবলে পড়েছে রামকৃষ্ণ মিশন, কিন্তু নিজস্ব স্বতন্ত্রতায়, আদর্শে বলীয়ান হয়ে আজও সে চিরভাস্বর। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক, যথা – সি জে স্টিভেন ম্যুর, চার্লস টেগার্ট, জি. সি ডেনহ্যাম, সি জি ডব্লউ ক্লগস্টন, এইচ কানিংহ্যাম প্রমুখের রিপোর্টেই রামকৃষ্ণ মিশনের বিপ্লবের চালিকাকেন্দ্র বলে তুলোধনা করা হয়েছে - বলা হয়েছে, "A Dangerous association."

১৯০৫ সাল থেকেই চলেছে ব্রিটিশ পুলিশের কড়া নজরদারি। ১৯১৭ সালে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ ছিল, বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলনে সমিতির

কাছের। পুলিনবিহারী দাস, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত তাঁদের আত্মকথায় বাংলাদেশের মাদারিপুরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সঙ্গে বিপ্লবী সংগঠনের জড়িত থাকার কথা বলেছেন। এমনকি বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের জন্য স্বামী প্রণবানন্দকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলেও তাঁকে জেলবন্দী করে রাখতে পারেনি বেশিদিন।

আমরা যদি, ব্রিটিশ সরকারের গোপন ফাইলগুলি দেখি,সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর নজরদারির জন্য একটি বিশাল তালিকা দেখতে পাবো গোয়েন্দাদের। তাঁদের মধ্যে, প্রমোদ মুখার্জী, নরেন্দ্রকুমার মল্লিক, সমরেন্দ্র মিত্র, শশীভূষণ দে, এফ. আহমেদ প্রমুখের কথা বলা যায়। ১৯০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ক্রিমিনাল ইন্ট্যালিজেন্স অফিসার স্টিভেন ম্যুর একটি গোপন সার্কুলার প্রকাশ করেন- 'Note on Political Sadhus' নামে। বড়লাট ডাফরিনের নির্দেশে ১৯০৪ সাল থেকেই মিশনের সাধুদের উপর নজরদারি শুরু হয়ে যায়। ম্যুরের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, সরকার স্বামী বিবেকানন্দ ও ১৮৯৭ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপে দেশপ্রেমের আঁশটে গন্ধ পাচ্ছে। স্টিভেন ম্যুর সংকলিত এই রাজনৈতিক রিপোর্টেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধকারী সংস্থা ও অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীদের যোগাযোগ। এছাড়াও ভগিনী নিবেদিতাকেও বিপ্লবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'Aggressive Hinduism 'গ্রন্থটিও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

১৯১১ সালের ৭ আগস্ট গোয়েন্দা স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর এফ. সি ড্যালি এক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন এক ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠান। এরাই বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিমূল। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ১৯১৪ সালের ২২ এপ্রিল একটি রিপোর্ট পেশ করে, যার নাম ছিল 'রেড বুক'। তাতে লেখা হয়, রামকৃষ্ণ মিশন বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্য করছে। ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিষয়টি চিন্তার। টেগার্ট তাঁর রিপোর্টে বলেন, বেলুড়ের বাইরে বৃহৎ পূর্ববঙ্গের জেলা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মিশনের যে একাধিক শাখাকেন্দ্র ও গ্রাম আশ্রমগুলি

গড়ে উঠেছিল তাদের অনেকগুলিই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আনাগোনার কেন্দ্র ছিল। রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানকে বিপ্লবীরা নিজেদের প্রচারের জন্য ব্যবহার করছে।

১৯১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর কলকাতার রাজভবনে আয়োজিত সভায় গভর্ণর কারমাইকেল অভিযোগ করেছিলেন, মিশনের সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পড়ে রাজনীতি

করছে। তারা ঢাকায় বিপ্লবীদের আশ্রয় দেয় এবং দাঙ্গাও বাঁধাতে চায়। গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বলে মিশনের কার্য সরকারের পছন্দ হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের সেই বক্তব্যের অনুরণন কি শুনতে পাচ্ছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে পাঠকগণ!!! ১৯১৭ সালের ৪ঠা জুনের ব্রিটিশ সার্কুলারে বিপ্লবীদের প্ররোচনাকারীরূপে নাম দেখা যায় স্বামী অখন্ডানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দের। যেভাবে এখন মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়া জারি হয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহসভাপতি কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে। বাংলার বিপ্লবীদলগুলো রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা যে প্রভাবিত ছিল একথা মিথ্যা নয়। হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ পাল, প্রতুল গাঙ্গুলি, বাঘাযতীন সহ বিপ্লবী নেতৃত্ব মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মানিকতলা বোমা মামলার বিপ্লবী কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মিশনেই যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২৪ সালে স্টিভেন্স তাঁর লেখা রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশনকে বিপ্লবীদের কাছের সংগঠন বলে উল্লেখ করলেও এটাও বলেছেন যে মিশন কোনোভাবেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতি থেকে শত যোজন দূরে অবস্থান করতো। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্য এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, মিশন রাজনৈতিকভাবে কোনোদিনই কোনো পদক্ষেপ নেয়নি,

বিপ্লবীরা নিজেদের আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন মিশনে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খন্ডে বহু বিপ্লবীর নামোল্লেখ করেছেন, যারা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার মধ্যে নলিনীকান্ত কর, অরুণ গুহ, জীবনতারা হালদার, লীলা রায়, অনিল রায়, সূর্য সেন, বিভূতি চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নেতাজীও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে প্রতিনিয়ত যেতেন সুভাষচন্দ্র।

ব্রিটিশ শাসন পেরিয়ে বামপন্থী শাসনেও কদর্যাকার রাজনৈতিক আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে রামকৃষ্ণ মিশন অধিগ্রহণ করার জন্য পার্টি ও প্রশাসন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে কুৎসা শুরু হয়। আশিষ লাহিড়ীর লেখা থেকে জানা যায়, সত্তরের দশকে কমরেড সমর সেনদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বাম-অতিবাম পত্রিকায় বিবেকানন্দ কুৎসা প্রকাশিত হতো। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত তো বলেই ফেলেছিলেন- "আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে বেলুড় মঠের মন্দিরকে আমরা কফি হাউস বানাবো"। শাসকের রক্তচক্ষুর শিকার সবসময়ই হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন। শাসক বদলেছে, শুধু বদলায়নি তার কণ্ঠস্বর। সেই জুতোয় পা গলিয়ে আক্রমণে নেমেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। বিস্মৃত হয়েছেন এই ইতিহাস। ভুলে যাবেন না মাননীয়া, মানুষ কিন্তু এই বাম দাম্ভিকতার শিকড় উপরে ফেলেছিল। ইতিহাস সাক্ষী আছে, মিশনের উপর যখনই আক্রমণ নেমে এসেছে। তখনই কালদেবতার অমোঘ নিয়মে শাসকের সিংহাসন টলমল করেছে। এক্ষেত্রেও কিন্তু অন্যথা হবে না।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

ডঃ সুকান্ত মজুমদার

ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে তৃণমূলের কারচুপি

পল্লব মন্ডল

মুসলিম ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে মমতা সরকারের ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে কারচুপি, আদালতে ধরা পড়ল হাতেনাতে। মুখে হালুম হুলুম করলেও প্রবল চাপে 'মমতাময়ী'। তার মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক তো গেল বলে। ঘরে বাইরে চাপের মুখে পড়ে মমতার হুঙ্কার তিনি সুপ্রিমকোর্টে যাবেন। সুপ্রিমকোর্টে গেলে কি সাতখুন মাফ হয়ে যাবে? ওনার জন্য সুপ্রিমকোর্টে তো কেউ 'তুষ্টিকরণের' রসগোল্লা নিয়ে বসে নেই।

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই এসেছিল কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়। ২০১০ সালের পরে তৈরি হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করার এবং এই তালিকা অবৈধ বলে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র। যদিও ২০১০ সালের আগের ঘোষিত ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের শংসাপত্র বৈধ এবং ২০১০ সালের পরে ওবিসি সংরক্ষণের কারণে যারা চাকরি পেয়েছেন বা নিয়োগপ্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তাদের চাকরি বহাল থাকবে। শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বর্তমান সরকারের শাসনকালে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসিদের তালিকা বাতিল করা হল। সেইসঙ্গে, ওবিসিদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়ার পরই তালিকা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

ইন্ডি জোট এবং তৃণমূলের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বুলি নস্যাৎ করে দেওয়া হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সমাবেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের দৃশ্যমানতা মাননীয়ার মুসলিম প্রীতিতে আঘাত হেনেছিল বলেই তিনি মুসলিম তুষ্টিকরণ জন্য আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা বলেন, যা সম্পূর্ণরূপে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণকে রাজনৈতিক তুষ্টির জন্য ব্যবহার করার নজির।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুসলিম ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে টিএমসি সরকারের বিরুদ্ধে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে কারচুপি করার অভিযোগ রয়েছে। মুসলিম ভোটারদের মুখ্যমন্ত্রী মমতার প্রধান ভোটব্যাঙ্ক বলে মনে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে তাদের জনসংখ্যা ৩০% -এর অধিক। সুতরাং সংখ্যাগুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় এই সম্প্রদায় কি ভাবে সংখ্যালঘু স্ট্যাটাস ভোগ করে তা একটি বড় প্রশ্ন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহ প্রদান এবং

তাদের স্থায়িত্ব প্রদান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক। এ থেকেই বোঝা যায় যে পদক্ষেপটি প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করার পরিবর্তে টিএমসির ভোটব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা।

ফলস্বরূপ, ক্ষমতাসীন দলের ২০১২ সালে প্রণীত নীতিটি কেবল জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের সারমর্মকেই ক্ষুণ্ন করে না, সেই সঙ্গে এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণকেও ইন্ধন যোগায়, যাদের প্রকৃতপক্ষে এই সংরক্ষণের প্রয়োজন। তাই, মুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি মর্যাদা দান, টিএমসি সরকারের সামাজিক ও শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক সংরক্ষণের অপব্যবহার। কলকাতা হাইকোর্ট এই রায়দানের মাধমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা তথ্য ছাড়াই ওবিসিদের উপশ্রেণিবিন্যাসের সুপারিশ করেছিল। রাজ্য কমিশন এবং সরকার জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি এবং আপত্তির উপর কর্ণপাত না করে এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলিকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে অস্বচ্ছ এবং পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে শুধুমাত্র মুসলিম তোষণের কারণে। আদালত জানায় যে রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ প্রদান সম্পর্কে সংবিধানের ১৬ (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিগুলি মেনে চলা উচিত, যা সরকার উপেক্ষা করেছে।

কেন হিন্দু রিজার্ভেশন ভাগ করা হলো অবৈধ ভাবে?

এই রায় থেকে উদ্ভূত মৌলিক প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল কেন হিন্দু বর্ণ-ভিত্তিক সংরক্ষণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যত বিলিয়ে দেওয়া হল? সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পরা শ্রেণির উন্নতির জন্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে সংরক্ষণ রাজনৈতিক তোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠল কেন? এই দুই প্রশ্নের ব্যখ্যা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ হলেও অতিসরলিকৃত উত্তর হলরাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক দখলের মাধ্যমে নিজেদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার লিপ্সা, যা তুষ্টিকরণের দ্বারাই সম্ভব।

এই ক্ষমতার লোভই টিএমসিকে ২০১২ সালের আইন দ্বারা মুসলমানদের ওবিসি সংরক্ষণের পথকে সুগম করে তলে, যা

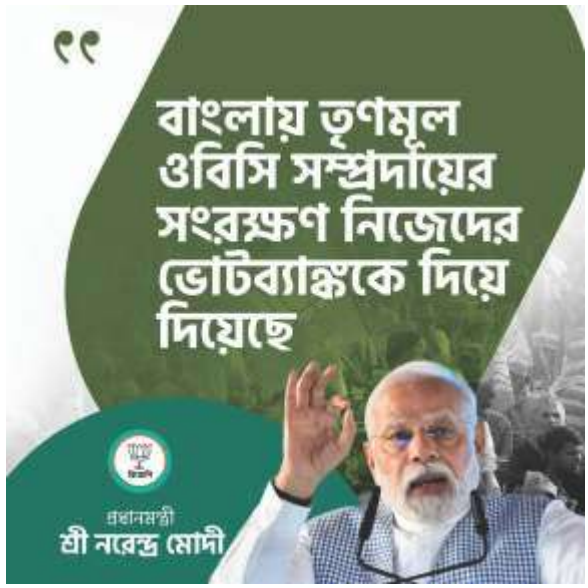

আসলে তাদের ভোটব্যাঙ্ক দখলের চেষ্টা মাত্র। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা নিজেদের এমন একটি ধর্ম বলে দাবি করে যা বর্ণপ্রথা মেনে চলে না। তাদের সংখ্যালঘু কোটা বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কোটা আগে থেকেই থাকলেও কোন কোন রাজনৈতিক দল এই সম্প্রদায়গুলিকে ওবিসি মর্যাদা দাবি করার অনুমতি দিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে দেয়। অধিকন্তু, এটি সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত তাদের ন্যায্য সুবিধা থেকে যোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে।

যোগ্যতার উপর রাজনৈতিক তুষ্টিকরণ?

টিএমসি এবং ইন্ডি জোটের দলগুলি সংখ্যালঘুদের ওবিসি কোটায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাদের ইশতেহারগুলি সরাসরি একথা না বললেও তাদের কর্মকান্ডগুলি তাদের এই অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। কর্ণাটকে সিদ্দারামাইয়া প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি দেখুন! এই দলগুলি সমাজের নিপীড়িত অংশের সুবিধার জন্য সংবিধানে রাখা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উপহাস করছে। তারা অহিন্দু সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ওবিসিদের সংরক্ষিত আসন ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করছে! ক্রমেই প্রকাশ হচ্ছে, ওবিসি কোটা সরকারি কর্মসংস্থান এবং শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক ব্যবস্থাকে বাইপাস করার জন্য নির্দিষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে অনুমতি দেওয়ার একটি কৌশল হয়ে উঠেছে। অহিন্দু ধর্মগুলির ওবিসি মর্যাদা প্রসারিত করে রাজ্য সরকারগুলি যোগ্যতার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলিকে অবজ্ঞা করছে! এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল জনসাধারণের আস্থা নষ্টই করে না, ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য নীতিগুলির জন্য একটি বিপজ্জনক নজিরও স্থাপন করছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় তৃণমূল সরকার এবং তুষ্টিকরণের রাজনীতি করা সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য একটি নজির হওয়া উচিত। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজের কিছু অংশকে সন্তুষ্ট করার জন্য অবিচারের পথ অবলম্বন করতে দেওয়া উচিত নয়। রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই সমস্ত সম্প্রদায় ও জাতির সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এবং রাজনৈতিক চাপ কেবল সামাজিক কাঠামোর ক্ষতিসাধন ঘটাবে। যে সরকার এই ধরনের বিপজ্জনক নীতি গ্রহণ করছে, তারা ভারতের জনগণের সঙ্গে ঘৃন্য সাম্প্রদায়িক খেলা খেলছে। কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে হওয়া মারাত্মক ভুল সংশোধন করে, এই সিদ্ধান্তে সনাতনীরা আনন্দিত। আশা করি এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হিন্দু সংরক্ষণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে। সবশেষে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং রাজশেখর মান্থার রায়টি মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতে হিন্দুদের অধিকারের বিনিময়ে রাজনৈতিক তোষণের ঘটনা একেবারেই সংবিধান বিরোধী।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ভারত সরকারের বন্দর, নৌপরিবহন ও নৌপথ প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর

ভারতবর্ষে হিন্দু জনসংখ্যা কমানোর নতুন চাল

স্বাতী সেনাপতি

এই তথাকথিত অ্যান্টি ন্যাটালিস্ট আন্দোলনকারীরা কিন্তু পার্ক সার্কাস, খিদিরপুর কিংবা কোনও মিলাদে গিয়ে প্রচার চালায় না। এরা বেছে নেয় হিন্দু পাড়া, হিন্দু এলাকা, হিন্দু দম্পতি। এঁদের ফাঁদে পা দিলে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেতে পারে হিন্দু জাতিটাই। আর সেটাই এদের অবধারিত লক্ষ্যও বটে।

"The wombs of our women will give us victory" Houari Boumedeinne, PRESIDENT of Algeria to the UN. 1974.

এই বিখ্যাত বাক্যটির সঙ্গে আমরা হয়ত কম বেশি সকলেই পরিচিত। কথায় আছে জোর যার মুলুক তার। তাই দেশ হোক বা জাতি - নিজেদের পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখতে প্রজনন অত্যন্ত জরুরি। অন্য ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করার জন্য চাই সৈন্য বল বাড়ানো। জরুরি অপত্য তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যা বাড়ানো। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। ছোট্ট অ্যামিবা হোক বা মানব সভ্যতা - বিবর্তনের পথে টিকে থাকতে প্রতিটি জীবকেই তাই প্রজনন করতেই হয়। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়? যদি মানব জাতির প্রজনন বন্ধ করে দেওয়া হয়? কি ঘটবে তখন ? ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবে মানব জাতি। থাকবে না কোনও অস্তিত্ব। ঠিক এইরকমই মানবশূন্য পৃথিবী করার লক্ষ্যে কাজ করতে চাইছে অ্যান্টি ন্যাটালিষ্টরা (Anti-natalist)। বিশ্বের নানা দেশে এই অ্যান্টি ন্যাটালিজমের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতবর্ষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে থাবা বসাচ্ছে মূলত বামপন্থী, অসুস্থ 'Woke' কালচারের সদস্যরা।

অ্যান্টি ন্যাটালিজম কি এবং কারা এই অ্যান্টি ন্যাটালিষ্ট ?

জন বিস্ফোরণের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কম বেশি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হয় সরকারের তরফে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতিকে কিন্তু অ্যান্টি ন্যাটালিজমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। অ্যান্টি ন্যাটালিজম এক ধরণের বিকৃত মানসিকতা। এদের ধারণা পৃথিবীর উপর ইতিমধ্যেই বহু বোঝা রয়েছে। তাই খামোকা বাচ্চার জন্ম দিয়ে তাদের কষ্টের মধ্যে ফেলা যাবে না। পৃথিবীর বোঝা কমাতে তাই বন্ধ হওয়া উচিত প্রজনন। বাচ্চা নেওয়া অপরাধের থেকে কম নয় এদের কাছে। অ্যান্টি ন্যাটালিষ্টদের মতে, আপনার বাচ্চা জন্মাতে চায় কিনা সেটা না জেনে, তার অনুমতি না নিয়েই তাদের জন্ম দেওয়া অপরাধ ! শুনতে বোকা বোকা এবং যুক্তিহীন লাগলেও ধীরে ধীরে আলোচনায় উঠে আসছে এই থিওরি। ৯ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে দিনটি অ্যান্টি ন্যাটালিজম দিবস হিসেবে পালনও করে তারা।

ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে জাল বিছাচ্ছে অ্যান্টি ন্যাটালিষ্টরা

ধীরে ধীরে এদেশেও জাল বিস্তার করছে অ্যান্টি ন্যাটালিষ্টরা। মোটামুটি এক সময়ে বাম সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা বাড়ছে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া কলকাতা বইমেলায় লাগাতার প্রচার করা থেকে শুরু করে দিনের ব্যস্ততম সময়ে দমদম স্টেশনে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ - ধীরে ধীরে এরা ঢুকে পড়ছে সামাজিক জীবনে। বইমেলায় তরুণ দম্পতিদের হাতে ৫০০ কপি বই তুলে দিয়েছে তারা। অর্থাৎ মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীই এদের মূল লক্ষ্য।

ভারতের অ্যান্টি ন্যাটালিষ্টদের লক্ষ্য হিন্দু জনসংখ্যা কমানো !

বইমেলায় বই বিক্রিই হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রচার চালানো - এদের মূল লক্ষ্য তরুণ হিন্দু দম্পতি যারা সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করছে বা আগামী কিছু বছরের মধ্যে যারা মা-বাবা হতে চায়। তাদের প্রভাবিত করে হিন্দুদের সন্তান ধারণে অনুৎসাহিত করে হিন্দু জনসংখ্যা কমানোই এদের লক্ষ্য। রয়েছে অজস্র ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল। যার মাধ্যমে লাগাতার ব্রেন ওয়াশ করার কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা ছাপিয়ে তাকেও প্রচারের হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। ৩৪ বছর বাম অপসংস্কৃতির কারণে খুব দ্রুত

বিস্তার করাও সম্ভব হচ্ছে এই রাজ্যে। আর গোটা দেশের নিরিখে হিন্দু জনসংখ্যা কমার পরিসংখ্যানটি কিন্তু মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। সার্বিকভাবে ২০১৯-২১ সালে ভারতে 'ফার্টিলিটি রেট' কমে দাঁড়িয়েছে দুই শতাংশে। যা ২০১৫-১৬ সালে ছিল ২.২। 'হাম দো হামারে দো' থেকে কমে হিন্দুদের এক সন্তান নীতি এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এখনও মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার বেশি। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে জন্মগ্রহণের হার ২.১ ছিল, এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১.৯৪ শতাংশ। ২০১৫-১৬ সালে মুসলিমদের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণের হার ২.৬২ শতাংশ। যা এখন ২.৩৬ শতাংশে ঠেকেছে। উল্লেখ্য মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার কমলেও তা কিন্তু হিন্দুদের তুলনায় বেশি।

চোখ রাখা যাক আরও একটি পরিসংখ্যানে। ভারতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী ছয় দশকে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের অংশ বেড়েছে ৪ শতাংশ। একই হারে কমেছে হিন্দুদের অংশ। ১৯৫১ সালে দেশের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি ৪০ লাখ। ২০১১ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ কোটি ৬০ লাখে। অর্থাৎ হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ। একই সময়ে ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি থেকে বেড়ে ১৭ কোটি ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬ গুণ। অঙ্কের নিয়মে এটি খুব একটা আনন্দের বিষয় নয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যাক। একজন ভারতীয় হিন্দু যুবকের গড় বয়স ২৯ বছর। আর মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের যথাক্রমে ২৪ বছর ও ৩১ বছর। এর অর্থ হলো,

ভারতীয় খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমদের মধ্যে তরুণ-তরুণীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। ফলে আগামী দিনগুলোয় তাদের সন্তান হলে, মুসলমান নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার সর্বোচ্চ সুবিধাজনক বয়সে অবস্থান করবে যা ভারতের জনবিন্যাসকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইসলামের ভাবনা

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইসলামে হারাম। আমি সন্তানদের খাওয়াব কীভাবে, পরাব কীভাবে, এই চিন্তা থেকে যদি কেউ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহলে সেটি সম্পূর্ণ হারাম। কারণ রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুলআলামিন, রিজিকদাতা আল্লাহতায়ালা।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ২০১৮ সালে ইস্তাম্বুলে এক অনুষ্ঠানে বলেন, পরিবার পরিকল্পনা এবং গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা মুসলিম পরিবারের জন্য নয়। তিনি আরো বলেন, আমাদের বংশধরদের সংখ্যা বহুগুণে বাড়াবো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনা করা কোনো মুসলিম পরিবারের জন্য উচিত নয়। উল্লেখ্য সব জায়গাতেই মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণাই বর্তমান। আগামী দিনে বিশ্ব শাসন করার স্বপ্ন ওরা তাই মাতৃ গর্ভের মাধ্যমেই করতে চাই।

তাই খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই তথাকথিত অ্যান্টি ন্যাটালিস্ট আন্দোলনকারীরা কিন্তু পার্ক সার্কাস, খিদিরপুর কিংবা কোনও মিলাদে গিয়ে প্রচার চালায় না। এরা বেছে নেয় হিন্দু পাড়া, হিন্দু এলাকা, হিন্দু দম্পতি। এঁদের ফাঁদে পা দিলে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেতে পারে হিন্দু জাতিটাই। আর সেটাই এদের অবধারিত লক্ষ্যও বটে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক

নারায়ণ চক্রবর্তী

আদালত যতটা তদন্তকারী সংস্থাদের কাজে বেড়ি পরাতে ব্যস্ত, রাজনীতির দুর্নীতিকরণ আটকাতে কি ততটাই তৎপর? আদালতই শেষ ভরসা যে সাধারণ মানুষের কাছে তারা কোথায় যাবে? এর দায় কি কলেজিয়াম সিস্টেমে আসা বিচারকগোষ্ঠী নেবেনা?

"বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে" - পরাধীন দেশের কবির এই উক্তি স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও সমান প্রযোজ্য। বিভিন্ন গালভরা নামের প্রকল্প মারফত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের সাহায্যের জন্য যে সব স্কিম আছে তার সুফল নিম্ন আদালতে কজন পান তার হিসেব পাওয়া যায় না। আর আপিলে সুপ্রিম কোর্ট? সে তো শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের কাছে ভিন গ্রহের দ্বীপের মত! সুপ্রিম কোর্টে একজন ব্যক্তি মামলা লড়তে গেলে তার খরচের বহর সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের আইন ব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব নাগরিকের সুবিচার পাওয়ার অনুকুল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এর দায় কি শুধুই ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিবিদদের? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এখানে চেষ্টা করা হয়েছে। কোন ব্যাক্তি বা চেয়ারকে আক্রমণ করার লক্ষ্য এখানে নেই। আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে দেশের উচ্চ আদালতগুলির বিচারক নিয়োগ করা হত। এই পদ্ধতির কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা না থাকলেও পদ্ধতিগতভাবে এর বিরোধিতা করার মত সাংবিধানিক স্বীকৃতিও ছিল না। তারপর দেশের জরুরী অবস্থা, বহুদলীয় সরকার ইত্যাদি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের তিনটি রুলিং এল যেখানে উচ্চ আদালতগুলিতে কলেজিয়াম পদ্ধতির মাধ্যমে বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়াকে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ ৪-১ বিচারকের রায়ে মান্যতা দেওয়ার আদেশ দিল। এই পদ্ধতিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক দ্বারা নির্দেশিত বিচারকদের কলেজিয়াম উচ্চ আদালতগুলিতে বিচারক নিয়োগ ও বদলির ব্যাপারে একমাত্র নির্ণায়ক ভূমিকা নিল।

যে তিনটি কেসের পর এই সিস্টেম গ্রহণ করা হয়, সেগুলি হল -

১) এস পি গুপ্তা বনাম ভারত সরকার - ১৯৮১;

২) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি বনাম ভারত সরকার, ১৯৯৩;

৩) ১৯৯৮ এ প্রথম মামলাটির বিশেষ রেফারেন্স মামলা।

এই শেষেরটি কোন মামলা নয়, বরঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মন্তব্য মাত্র! ১৯৯৩ সালের রায়ের পরপর সুপ্রিম কোর্ট অতি তৎপরতায় কলেজিয়াম পদ্ধতি চালু করে! এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন - এই কলেজিয়াম পদ্ধতির কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই এবং এটি একটি অস্থায়ী প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে একটি এনজিও (সুরজ ইন্ডিয়া ট্রাস্ট) এই কলেজিয়াম পদ্ধতির সিস্টেমকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করলে সুপ্রিম কোর্ট তার

"locus standi" নেই বলে পত্রপাঠ মামলা খারিজ করে দেয়!

তারপর ২০১৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দেশের রাজ্যসভায় ১২০তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ১২৪(২) এবং ২১৭(১) ধারায় পরিবর্তন এনে National Judicial Appointment Commission তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়, যার রেকমেন্ডেশানের ভিত্তিতে দেশের রাষ্ট্রপতি উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ করবেন। আশ্চর্য হচ্ছে, এই সংশোধনের ক্ষমতা দেশের কোন বিচারকের নয়, দেশের আইনসভার হাতে ন্যস্ত আছে। অথচ, ১৬ অক্টোবর, ২০১৫ তে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারকের সংবিধান বেঞ্চ এই কমিশন তৈরীর ব্যাপারটাকেই অসাংবিধানিক আখ্যা দেয়! পাঁচ জজের মধ্যে বিচারকরা জে এস কেহর, মদন লোকুর, ক্যুরিয়ান যোসেফ, আদর্শ কুমার গোয়েল এই রায় দিলেও বিচারক চেলামেশ্বর এই কমিশন তৈরীর পক্ষেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ এই রায় কিন্তু সর্বসম্মত ছিল না।

এবার আসি এই কলেজিয়াম পদ্ধতির স্বচ্ছতা এবং আদালতের কাজে তার প্রভাব কি পড়েছে সেই বিশ্লেষণে। এখানে সুপ্রিম কোর্টের চিন্তাধারায় এটা পরিষ্কার যে তারা বিচারক চয়ন ও তাদের বদলির ব্যাপারটা নিজেদের হাতে রাখতে বদ্ধ পরিকর - এমনকি এ বিষয়ে তাদের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকলেও! ভারতের যে কোন চেয়ারের দায়িত্ব এবং দায়ভার আছে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতিরাও তার উর্ধে নন। প্রথমে বলি, এই কলেজিয়াম পদ্ধতিতে যে স্বচ্ছতা আমরা দেখছি তাতে বলা যায় যে দেশের কয়েকটি বিশেষ বিচারকের পরিবার এবং বিশেষ আইনজীবীর পরিবার থেকেই ৭০ শতাংশের বেশি উচ্চ আদালতের বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এভাবে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার বদলে তাকে বিশেষ কিছু তথাকথিত উচ্চবর্গীয় পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা কতটা সঠিক।

যে কারনে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাদের সাংবিধানিক সীমার বাইরে গিয়েও রায় দিচ্ছেন! মনে রাখা দরকার, দেশের সংবিধান সর্বোচ্চ গাইডলাইন। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও তা মানতে বাধ্য। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল নিয়োগের কমিশনকে মান্যতা না দিয়ে নিজেদের হাতে বিচারক নিয়োগ ও তাদের বদলির বিষয়টা রাখলেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা তাদের রায়ের সাংবিধানিক বৈধতা দেখাতে পারেননি। সংবিধান পরিমার্জন সহ আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দেশের সংসদের, সুপ্রিম কোর্টের নয়। আইন মোতাবেক দেশের আম জনতা যাতে সঠিক বিচার পায় সেটা দেখা সুপ্রিম কোর্টের কাজ।

অথচ, এই কাজে আমাদের জুডিশিয়ারির কোন দায়বদ্ধতা আছে কি? উচ্চ আদালতে মামলা লড়ার খরচ, ও দীর্ঘসূত্রিতা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হয়ে যাচ্ছে। একটি বহুল প্রচলিত কথা আছে, "justice delayed, justice denied"। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এর যথার্থতা অপরিসীম। যেমন, রাজ্যের উচ্চ আদালতে রাজ্য কর্মচারীদের ডিএ সংক্রান্ত মামলার রায় বেরোনোর পর রাজ্য সরকার আপিলে সুপ্রিম কোর্টে যায়। সেই আপিলের বছর ঘুরে গেলেও বিভিন্ন কারনে এখনও শুনানি হল না, রায় দান দুরস্ত! আমাকে একজন শামলা গায়ের উকিলবাবু বললেন,"আরে আপনারা সাধারণ মানুষ জানেন না, এ সব মামলার পদ্ধতি আছে - তাতেই সময় লাগে! ঠিক। আমিও তো সেকথাই বলছি। এই বিচার ব্যবস্থা এবং তার সুফল সাধারণ মানুষ পায়না - হয়ত তথাকথিত পদ্ধতিগত কারনেই! অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাব। আবার দেখুন, কোন বিশেষ রাজনৈতিক নেতার জামিনের জন্য রাত দুপুরের পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বসতে পারে! অর্থাৎ, ঐ একই কথা, সুপ্রিম কোর্টের এবং উচ্চ আদালতের বিচার ব্যবস্থার উপর দায়বদ্ধতা সমাজে ক্ষেত্র বিশেষে তফাৎ হয়! তাই যদি হয়, তো সাধারণ মানুষের করের টাকায় এত বড় বিচার ব্যবস্থা রেখে লাভ কি? শুধুমাত্র বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য, তাদের অর্থে বিচার ব্যবস্থা থাকলেই হয়!

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আইন তৈরীর কাজ দেশের আইনসভার, দেশের সুপ্রিম কোর্টের নয়। প্রথম দিকে সুপ্রিম বিচারকরা এটি মেনে চললেও কলেজিয়াম পদ্ধতিতে নিযুক্ত বিচারকদের সময়ে এ বিষয়ে তাদের ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখা যাচ্ছে। হয়ত এই পদ্ধতিতে এমন মধু আছে যে সে মধুভান্ড যেন-তেন-প্রকারেন ধরে রাখতে বিচারকরা এত বদ্ধ পরিকর।

এখানে একটি আশঙ্কার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখনো পর্যন্ত দেশের আইনসভা তেমন কোন শক্ত পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু যে কোন মানুষেরই এক সময় ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে। যদি আইনসভা আইন করে কলেজিয়াম পদ্ধতি, যা শুরু থেকেই সাংবিধানিক অনুমোদন ব্যতীত একটি অস্থায়ী পদ্ধতি, বাতিল করে জুডিসিয়াল কমিশনকে আইনি স্বীকৃতি দেয় এবং আবার বিনা অজুহাতে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে, তখন প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স করলে সেটাও যদি এই বিচারপতিরা কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তা বাতিল করে, তখন তাদের ইমপিচমেন্ট করাই গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র উপায় হবে। এখানে বোঝাই যাচ্ছে, বিশেষ কায়েমী স্বার্থের কারনেই কলেজিয়াম পদ্ধতি রেখে দেওয়া হচ্ছে। এতে দেশের সাধারণ মানুষের লাভ তো হচ্ছেই না, কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়া অন্যদের ক্ষতিই হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এর ফলে আদালতের কর্মদক্ষতা কমেছে বই বাড়েনি। সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে চলে গেছে আদালতে লড়ার ক্ষমতা।

সাধারণ মানুষ যখন বিচারের নামে বারবার প্রহসন দেখে, তখন তাদের শক্ত চোয়াল আর চোখের আগুন বলে দেয় -

"আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই,

স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই"।

ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে জনগণের গোষ্ঠীবদ্ধ বিরোধীতা এই সিস্টেমের পতনে কারন হবে।

লোকসভা নির্বাচনে জয়ী সকল প্রার্থীদের অভিনন্দন

বিজেপি

সুকান্ত মজুমদার
বালুরঘাট

শান্তনু ঠাকুর
বনগাঁ

জগন্নাথ সরকার
রানাঘাট

খগেন মুর্মু
মালদা উত্তর

সৌমেন্দু অধিকারী
কাঁথি

কার্তিক চন্দ্র পাল
রায়গঞ্জ

রাজু বিস্তা
দার্জিলিং

জয়ন্ত কুমার রায়
জলপাইগুড়ি

মনোজ টিগ্গা
আলিপুরদুয়ার

জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো
পুরুলিয়া

সৌমিত্র খাঁ
বিষ্ণুপুর

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
তমলুক

লড়াই চলছে, চলবে

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ফেক নিউজ

ঢপবাজ ধ্রুব রাঠী

সম্প্রতি বিরোধীদের টুলকিট জার্মানি নিবাসী, মিথ্যে খবর এবং প্রোপাগান্ডার মুখ ধ্রুব রাঠী, চরম মিথ্যাবাদী এবং ভারত বিরোধী এই ইউটিউবারের দাবি মহারাষ্ট্রের এক লোকসভা কেন্দ্রে নাকি মোবাইল ফোনের ওটিপি দিয়ে ইভিএম হ্যাক করেছেন বিজেপি সাংসদ! কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির এই পোষা মিথ্যাবাদীর ট্যুইটকে নিজেদের শক্তি ব্যবহার করে ছড়িয়ে দেয় বিরোধীরা। কিছু পোষা মিডিয়াও খবর করতে আরম্ভ করে।

আসল খবর

যদিও খুব তাড়াতাড়িই ভুল প্রমাণিত হয় তারা। আবারও এক্সপোজ হয়ে যায় ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি ধ্রুব রাঠী আর তার মালিক কংগ্রেস-আপ। আসলে ভারতে ব্যবহৃত ইভিএম কারচুপি এক অসম্ভব কাজ। ইভিএম যে ১০০% সুরক্ষিত সেটা বিরোধীদেরও অজানা নয়। কিন্তু তবু রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন ইভিএম নিয়ে মিথ্যে প্রচার করতে পিছপা হয় না তারা।

কংগ্রেসের ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি

কংগ্রেস সম্প্রতি তাদের এক্স হ্যান্ডেলে একটা প্লাটফর্ম টিকিটের ছবি আপলোড করে ভুল ভাবে প্রচার করে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নাকি প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূল্য ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা করে দিয়েছে।

আসল খবর

যদিও বাস্তব সত্য হলো এই যে কোভিডের সময় মার্চ মাসে একুশ দিন লকডাউন ঘোষণা আগে সপ্তাহখানেক এর জন্য কয়েকটি করোনা আক্রান্ত এলাকার স্টেশনে টিকিট মূল্য ৫০ করা হয়েছিল ভিড় কমানোর জন্য যা লকডাউন ঘোষণার সাথে সাথেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। শেষ কয়েক বছর প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূল্য ১০ টাকাই আছে, বাড়েনি।

তপশিলি সংরক্ষণ, সংবিধান সহ বিভিন্ন হিন্দু বিরোধী ফেক নিউজ ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইউপির মতো রাজ্যে সাময়িক সাফল্য পাবার পর কংগ্রেসসহ বিরোধীরা ফেক নিউজকেই আবার অস্ত্র করতে চলেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। কংগ্রেসসহ বিরোধীদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ এবং এক্স হ্যান্ডেল তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

গান্ধী পরিবারের ফেক নিউজ

আয়ুশী প্যাটেল নামের একটি মেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও পোস্ট করে দাবি করে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে নাকি তার সাথে জালিয়াতি করেছে সরকার। মেয়েটির সেই ভিডিও খবর হিসেবে প্রচার করে অনেক ইলেকট্রনিক মিডিয়া। কংগ্রেস নেত্রী তথা গান্ধী পরিবারের পরবর্তী নিষ্ফল আশা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী নিজের ট্যুইটার বা এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করে সেই ভিডিও। আদালতে মামলাও হয় এই নিয়ে।

আসল খবর

পরে জানা যায় ওই মেয়েটির দাখিল করা সমস্ত তথ্য জাল। আন্দাজ করা যায়, বিরোধীদের থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়ে ওই জাল ভিডিও করেছে মেয়েটি। আর মানুষকে ভুল বোঝাতে সেটাই প্রচার করেছে বিরোধীরা।

মিথ্যাবাদী কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাথ

মুম্বাইয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে অটল সেতু। দু'ঘন্টার রাস্তা পথকে নামিয়ে এনেছে ১৫-২০ মিনিটে এই সেতু। সুপ্রিয়া দাবী করেছিল যে অটল সেতুতে নাকি ফাটল ধরেছে। মিডিয়াও সেই খবর বিরাট করে প্রচার করে। আসলে কি ঘটেছিল?

আসল খবর

এখন যে কোনো বড় ব্রিজ বানানোর সময় তার পাশে কিছু সার্ভিস রোড তৈরি করা হয় কাজের সুবিধার জন্য। যা সম্পূর্ণরূপে সাময়িক এবং সেতু ব্যবহারের পর যার কোন প্রয়োজন পড়ে না। স্বাভাবিকভাবে সেতু ব্যবহার শুরু হলে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এরকমই একটি সার্ভিস রোডের ফাটল ধরা ছবি আপলোড করে কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া দাবি করেছিল সেটি নাকি অটল সেতুর ছবি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় তার সেই পোস্ট। যদিও পরে জানা যায় অটল সেতুতে এরকম কোনো ফাটল নেই। অবশ্য সরকার এবং দেশকে বদনাম করার যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই পোস্ট সেটা ততক্ষণে কিছুটা সফল হয়ে গেছে।

মমতার রাজ্যে ফেক জিএসটি!

খুব সম্প্রতি জানা তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যে ৪৭০০ কোটি টাকারও বেশি ফেক জিএসটি বিল উদ্ধার হয়েছে! যদিও রাজ্য সরকার এই খবরকে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

West Bengal commercial taxes directorate busts Rs 4,716 crore fake GST invoice rackets, four arrested

The operators used to lure unsuspecting individuals with petty cash or promises of employment and fraudulently obtained their PAN, Aadhaar, and other identification documents. Using them, they incorporated several fake firms and obtained GST registrations.

আসল খবর

পরবর্তীতে জানা যায় রাজ্য সরকারের দাবি মিথ্যে এবং সত্যি সত্যি ব্যাপক ফেক জিএসটি বিল উদ্ধার হয়েছে এই রাজ্যে। ফেক নিউজ শুধু যে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত হানছে তাই নয়, দুর্বল করছে দেশের অর্থনীতিকেও। কখনও পরোক্ষে আর কখনো প্রত্যক্ষে। খুব স্বাভাবিকভাবে মিথ্যা খবর ছড়ানোয় মমতার রাজ্য যেমন এক নম্বরে তেমনই মিথ্যে যে কোন বিষয়ই এই রাজ্য এক নম্বরে।

মিথ্যা ছড়ানোয় কংগ্রেস-তৃণমূল ভাইভাই

কদিন আগে কংগ্রেস এবং তৃণমূল নেতারা দাবি করে এক খালিস্থানী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে কেন্দ্র করে ভারত এবং আমেরিকার

মধ্যে নাকি সম্পর্কের অবনতি হয়েছে! এজন্যেই নাকি ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি থেকে পিছিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র! তাদের মানবিক অবস্থানও এতটাই নিচে নেমে গেছে যে তারা দেশবিরোধী শক্তিকেও সমর্থন করতে পিছপা হয় না।

আসল খবর

যদি অন্য আরও অনেকবারের মতোই এবারেও মিথ্যা খবর প্রচার করছিল তারা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে কোন খালিস্থানি জঙ্গির জন্য দু'দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার নয়। এবং অবশ্যই চুক্তি মত সামরিক ড্রোন যথাসময়ে ভারতে রপ্তানি করবে তারা।

ইতালিতে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে পোপ ফ্রান্সিস, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি-র সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে

সকল ভোটারদেরকে গণতন্ত্রের এই উৎসবে অংশগ্রহন করবার জন্য এবং প্রত্যেক বিজেপি কার্যকর্তা যারা দলের প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই

গণতন্ত্রের জয় হোক

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।